

সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের ষষ্ঠ কেন্দ্রীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত

শিক্ষা বাণিজ্য বন্ধ, গণতান্ত্রিক ক্যাম্পাস প্রতিষ্ঠার দাবিতে ছাত্ররাজনীতির আদর্শবাদী বিপ্লবী ধারাকে শক্তিশালী করার আহ্বান

সবার জন্য শিক্ষার অধিকার প্রতিষ্ঠা, উন্নত সংস্কৃতি অর্জন আর নৈতিকতার সংগ্রামকে এগিয়ে নেওয়ার আহ্বানে অনুষ্ঠিত হলো সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের ষষ্ঠ কেন্দ্রীয় সম্মেলন। ৭ অক্টোবর ২০২৬ সকাল ১১টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অপরায়ে বাংলার পাদদেশে সম্মেলনের উদ্বোধন ও র্যালি এবং বিকেল ৪টায় কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে আলোচনাসভা, কমিটি পরিচিতি ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়।

সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের সভাপতি মুক্তা বাউড়ে-এর সভাপতিত্বে সম্মেলন উদ্বোধন করেন বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির উপদেষ্টা কমরেড খালেদুজ্জামান।

বিকেলের আলোচনাসভায় বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ, ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ফারহা তানজিম তিতিল, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক আলী রায়হান সরকার, শ্রীলঙ্কার সোশ্যালিস্ট স্টুডেন্ট ইউনিয়ন (SSU)-এর ন্যাশনাল কমিটির সদস্য ডিলান আরোসা, অল নেপাল ন্যাশনাল ইনডিপেনডেন্ট স্টুডেন্ট ইউনিয়ন (রেভ্যুলিউশনারী) (ANNISU)-এর সহসভাপতি কৃষ্ণ বাহাদুর সোনার এবং ছাত্র ফ্রন্টের সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটির আহ্বায়ক রিনা মুরমু। সম্মেলনে ভারতের আইসার পক্ষ থেকে সভাপতি নেহা বোরা ও পাকিস্তানের ডিএসএফ-এর পক্ষ থেকে কাফি সোমা ভিডিও বার্তা পাঠিয়েছে। উভয় অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক রায়হান উদ্দিন।

উদ্বোধনী বক্তব্যে কমরেড খালেদুজ্জামান বলেন—রাজনীতির জমিনে বর্তমানে চলছে ভূমিকম্প, নীরব দুর্ভিক্ষ নিঃশব্দে এগিয়ে চলছে



জনজীবন লভ্য করে। চারদিক থেকে ধেয়ে আসা সংকটকালের বড়ো দুঃসময়ে, নবজাগরণ ও মুক্তির দুর্বীর সংকল্প নিয়ে যৌবন-তারুণ্যের অদম্য শক্তির আশা জাগানিয়া আজকের এই সমাবেশকে জানাই বিপ্লবী অভিনন্দন।

সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের ষষ্ঠ সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সম্মানিত সভাপতি, ছাত্র ফ্রন্টের জন্মলগ্ন থেকে যারা মেধা, শ্রম ও সাধনা দিয়ে সংগঠনকে আজকের জায়গায় আনতে ভূমিকা রেখেছেন, তাদের মধ্যে যারা আজ উপস্থিত হয়েছেন নানা কারণে যারা আসতে

পারেননি এবং যারা চিরদিনের মতো হারিয়ে গেছেন, তাদের সকলের প্রতি রইল অসীম ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা। উপস্থিত আমন্ত্রিত স্বদেশি ও বিদেশি সংগঠনসমূহের নেতা ও কর্মীবৃন্দ, বাসদসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও গণসংগঠনসমূহের নেতা-কর্মীবৃন্দ, বিবেকের ডাকে সাড়া দিয়ে উপস্থিত হওয়া সুধীজন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের সদস্যবৃন্দ, আজকের আয়োজনে যারা অর্থ দিয়ে, ভরসা দিয়ে, নানা মুখী সহযোগিতা দিয়ে অংশীজন হয়েছেন, তাদের সবার প্রতি জানাই

কৃতজ্ঞতা ও প্রাণঢালা অভিনন্দন।

সংগ্রামী বন্ধুগণ, একটু পরেই হবে সম্মেলনের উদ্বোধন। বিকেলের অধিবেশনে আমাদের নেতৃবৃন্দ বিস্তারিত কথা বলবেন। আমন্ত্রিত ছাত্র নেতৃবৃন্দ তাদের নিজস্ব অভিজ্ঞতা তুলে ধরবেন। আমি উদ্বোধনের আগে আপনাদের সামনে দু-চারটি বিষয়ে কথা বলে নিতে চাই। অনেক প্রশ্ন দেশের জনগণের মনে। অনেক জিজ্ঞাসা চারদিকে; এর সব বিষয়ে আমরা আজকের আলোচনায় তুলে ধরতে পারব না।

এর পর পৃষ্ঠা ২ কলাম ১

কার্যকর সমাধানের লক্ষ্যে সমস্যার মূলে যেতে হবে, নইলে দুর্গতি কমবে না

বিশ্বে যুদ্ধোন্মাদনা আর দেশে রাজনৈতিক অস্থিরতা দেখে বিপন্ন মানুষ ভাবছে শান্তি কোথায়? বিশ্বের দেশে দেশে চলছে সম্পদ দখল, ভূ-রাজনৈতিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠায় সাম্রাজ্যবাদী দস্যুতা ও আত্মসী তৎপরতা। আর দেশে চলছে অনিয়ম অরাজকতা। গণতন্ত্রের জন্য আন্দোলন অভ্যুত্থান সত্ত্বেও শাসনক্ষমতা গণতন্ত্রের নামে বাস্তবে মোড়লি ব্যবস্থা অতিক্রম করতে পারছে না। প্রধান বুর্জোয়া দল ও শক্তিসমূহের মধ্যে লুটপাটের নীতির এক্য থ কলেও গোষ্ঠী দ্বন্দ্ব চরমে। পুঁজিবাদী অর্থনীতি আর বুর্জোয়া রাজনীতি সাধারণ মানুষের জীবনে দুর্ভোগ বাড়ালেও ক্ষুদ্র একটি দাপুটে অংশের বাড়ছে সমৃদ্ধি, সুখ। দুর্নীতি, লোভ-লালসা,

ব্যক্তিকেন্দ্রিক স্বার্থপরতা যত বাড়ছে, ততই নীতি-নৈতিকতা আদর্শবাদিতা ক্রমাগত যাচ্ছে হারিয়ে। বুর্জোয়া রাজনীতির এটাই ফলাফল। এরা জনগণকে যতটা নামাতে পারবে, বুর্জোয়া গোষ্ঠী তত উপরে উঠবে। কিন্তু এর বিপরীত হলো বিপ্লবী রাজনীতি, উন্নত সংস্কৃতি, এখানে তা হয় না। তাই বামপন্থার রাজনীতি ও সংস্কৃতির উপর বুর্জোয়া শ্রেণির এত আক্রোশ-আক্রমণ।

ক্ষমতার মোহে, লোভে আর টিকে থাকার তাগিদে শাসকরা শুধু বন্দর নয়, দেশের স্বার্থ, জনস্বার্থ ইজারা দিতে কুণ্ঠিত হচ্ছে না। এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা করছে? প্রতিবাদের শক্তি এখন রাজপথে, বামপন্থীদের কণ্ঠে মিছিলে।

শাসকগোষ্ঠীর পক্ষ থেকে পার্লামেন্টকে সকল কাজের কেন্দ্র বলার একটা চল থাকলেও পার্লামেন্ট এক্ষেত্রে নীরব। তবে নিজেদের স্বার্থ, সুবিধা এবং অপ্রয়োজনীয় বিতর্কে সংসদ সরগরম রাখার চেষ্টা করে যাচ্ছে। আর এগুলোর প্রচার দিয়ে প্রচার মাধ্যম তাদের ভাসিয়ে রাখছে জনদৃষ্টির সামনে। জনগণের কাঁধে চেপে, জনস্বার্থ উপেক্ষা করে এভাবেই গণতন্ত্রকে ভোটতন্ত্রে পরিণত করা হয়েছে। ভোটের বাজারেও চরম বিশৃঙ্খলতা। তাই ডাঙাতন্ত্র দিয়ে শাসনোন্নয়নকে কেউ কেউ ভাবছে। দেশের এই পরিস্থিতিতে গণ-অভ্যুত্থানে উচ্ছেদ হওয়া শক্তির পুনর্বাসনের রাস্তা প্রসারিত হচ্ছে। ভালোর চেয়ে আরও ভালো নয় খারাপ আর অতি খারাপের

মধ্যে গ্রহণ-বর্জনের মাঝে দেশের হিসাবনিকাশ, দেশের প্রয়োজন বিবেচনায় নয় বিদেশি অঙ্কে মেলাবার ও মিটানোর চেষ্টা চলছে।

ধর্মকে ব্যক্তিগত আচারনিষ্ঠার বদলে রাজনৈতিক ক্ষমতার সিঁড়ি ও সাম্প্রদায়িকতার জ্বালানিতে পরিণত করা হয়েছে। হাম-ডেঙ্গু, ক্যাসারে যত প্রাণহানি হচ্ছে, তার চেয়ে অধিক সাম্প্রদায়িকতার বিষে মানসিক স্বাস্থ্যহানি ঘটছে। বিজ্ঞান শিক্ষা ও বিজ্ঞান মনস্তত্ত্বের বদলে কারিগরি জ্ঞানসৃষ্ট ভোগ উপকরণ লাভের ও ভোগের তাড়না বাড়ছে। শিক্ষা বাস্তবে শিক্ষাহীনতা, অশিক্ষা ও কুশিক্ষা একদিকে, অন্যদিকে উচ্চমূল্যে অর্জিত সার্টিফিকেটে এর পর পৃষ্ঠা ৩ কলাম ১

পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদের অস্তিম লগ্ন চলছে, তারা ধ্বংস চালিয়ে এ শতাব্দী শেষ হওয়ার আগেই ইতিহাসের মঞ্চ থেকে বিদায় নেবে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

এখন যে কথাটা সামনে আসছে—বারেবারে এ দেশে অভ্যুত্থান হয়, গণ আন্দোলন হয়; ছাত্র-শ্রমিক, কৃষক-নারী, মধ্যবিত্ত, বুদ্ধিজীবী সর্বস্তরের মানুষ জীবন দেয়, সংগ্রাম করে, রক্ত ঝরায় এবং সংগ্রামে জয়লাভ করে। কিন্তু অভ্যুত্থান বা আন্দোলনে বিজয়ের পরে জনগণের কাছে তার সুফল আসে না কেন? যতদিন আন্দোলন চলে, ততদিন তারা সামনে থাকে। যখন আন্দোলন শেষ হয়, তখন গোটা আন্দোলনের ফসল একটি লুটেরা গোষ্ঠীর হাতে চলে যায়। এটা আমাদের মুক্তিযুদ্ধের পর হয়েছে, '৯০-এর অভ্যুত্থানে হয়েছে, '২৪-এর অভ্যুত্থানে হয়েছে। এর কারণ, আমাদের দেশের মানুষ দুই শ্রেণিতে ভাগ হয়ে আছে—৫ ভাগ শোষক, ৯৫ ভাগ শোষিত। আন্দোলন যখন চলে, তখন ৯৫ ভাগ মানুষের আকাঙ্ক্ষা-স্বপ্ন, চাওয়া, জীবনদান—সেগুলো সামনে থাকে। কিন্তু যারা কয়েমি স্বার্থবাদের দল, শোষকগোষ্ঠী, তারা আন্দোলনে গা লাগিয়ে থাকে—যেই বিজয় অর্জিত হয়ে যায়, রাষ্ট্রযন্ত্রের শক্তিকে কাজে লাগিয়ে ক্ষুদ্র লুটেরা গোষ্ঠী সমস্ত ক্ষমতা কুক্ষিগত করে। যে কারণে বিজয় পর্যন্ত সামনে থাকে জনতার শক্তি, আর বিজয়ের পর কর্তৃত্ব আসে শোষকের শক্তি।

আমাদের মুক্তিযুদ্ধ ছিল জনযুদ্ধ। আওয়ামী লীগ মুক্তি সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়েছিল, কিন্তু এটা আওয়ামী যুদ্ধ ছিল না। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে গণহত্যার পর যখন প্রতিরোধ যুদ্ধ শুরু হলো, তখন আওয়ামী লীগের প্রধান নেতা শেখ মুজিবুর রহমান কারাগারে, আন্দোলন পরিচালনাকারী সরকার ভারতে; পুলিশ-আর্মি, বিডিআরের সদস্য—যারা বাহিনী থেকে বেরিয়ে এসে বিদ্রোহ করে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল—তাদের হাতে যে অস্ত্র ও গোলাবারুদ ছিল, তা ১০ এপ্রিলের মধ্যে শেষ হয়ে গিয়েছিল। অন্যদিকে যারা মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, তারা তখনও ভারতে ট্রেনিং নিচ্ছে। এই ট্রেনিংপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধারা বাংলাদেশে আসতে শুরু করে জুন-জুলাই মাসে। ফলে সংগঠিত প্রতিরোধ না থাকায় এই তিন-চার মাস পাকিস্তানি বাহিনী দেশে ব্যাপক গণহত্যা চালিয়েছে। এদের প্রতিহত করার জন্য দেশে তখন সামরিক কোনো শক্তি নাই, বাহিনী নাই, অস্ত্রশস্ত্র নাই। তখন নিরস্ত্র মানুষ রামদা-বল্লম, তীর-ধনুক, লাঠি, যার যা কিছু ছিল তাই নিয়ে তাদের প্রতিহত করেছে। নিজেরাই স্থানীয়ভাবে সংগঠিত হয়ে রাস্তা কেটে, ব্রিজ ভেঙে পাকিস্তানি বাহিনীর গতিরোধ করেছে।

সাধারণ মানুষের প্রতিরোধ আগেই শুরু হয়েছিল। ১৯৭১ সালে ১৯ মার্চ পাকিস্তান আর্মি জয়দেবপুর রাজবাড়িতে অবস্থিত দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের বাঙালি সৈন্যদের নিরস্ত্রীকরণ এবং তাদের ওপর নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার খবর পেয়ে গাজীপুরের বিভিন্ন এলাকার হাজার হাজার মানুষ রাস্তায় নেমে আসেন এবং এলাকা দখলে নেন। ২৮ মার্চ শত সহস্র মানুষ রংপুর ক্যান্টনমেন্ট আক্রমণ করে। এরা রংপুর জেলার বিভিন্ন থানা থেকে এসে জড়ো হয়েছিল। এখানে ব্যাপক সংখ্যায় আদিবাসীরা অংশ নেয়। মুক্তিযুদ্ধের দলিল থেকে দেখা যায়, পাকিস্তানি বাহিনীর গুলিবর্ষণে এই অসম যুদ্ধে ৫০০ থেকে ১ হাজার সাধারণ মানুষ নিহত হয়। এরকম গণপ্রতিরোধের অসংখ্য ঘটনা আছে দেশ জুড়ে। এ কারণে মুক্তিযুদ্ধে শহিদের সংখ্যা এত বেশি।

মুক্তিযুদ্ধের চেতনার কথা বললেই অনেকে '৭২ সালকে টেনে আনেন। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের চেতনা-আকাঙ্ক্ষা আকস্মিকভাবে '৭২ সালের সৃষ্টি নয়। যারা সে ইতিহাস জানেন না, তারাই আজ ইতিহাসের বয়ান দিচ্ছে। ইতিহাস সমাজবিজ্ঞানের একটি শাখা। তাই বিজ্ঞান গবেষণার যেমন নিয়ম আছে, ইতিহাস অনুসন্ধান ও গবেষণারও বিজ্ঞানভিত্তিক নিয়ম আছে।

ঐতিহাসিক বস্তুবাদের নিয়মে ইতিহাসকে বর্তমানে হাজির করতে হয়, ব্যাখ্যা করতে হয়। '৫২-এর ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু হয়ে '৭১-এর যুদ্ধ পর্যন্ত জাতিগত চেতনার উদ্ভাসিত মূর্ত রূপ হলো '৭২। সাম্য-মানবিক মর্যাদা, সামাজিক ন্যায়বিচার, গণতন্ত্র-সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ইত্যাদি আন্দোলনে মূর্ত রূপ নেওয়া এই চেতনাসমূহ-এগুলো শাসকগোষ্ঠী অস্বীকার করতে পারেনি। এগুলো ছিল শাসকদের বুলি আর, জনগণের প্রকৃত চেতনা। এখন গায়ের জোরে, উচ্চকিত শব্দে মূর্খামির শ্রোত তৈরি করে একদল সবকিছু ভাসিয়ে নিতে চায়। কাব্য-দর্শন, রাজনীতি-অর্থনীতি, ঐতিহাসিক বিবরণ—সর্বত্রই এই গোঁজামিল চলছে। এটা চলছে ক্লাসরুমে, বক্তৃতা-বৌদ্ধিক মঞ্চে; কিন্তু এই নিকৃষ্ট-চটকদার উৎপাদিত বস্তুর বাজার বেশি দিন থাকবে না।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর শাসকগোষ্ঠীর কাছে মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা হয়ে গেল চেতনার সাইনবোর্ড; পরবর্তী শাসকরা তাকে পণ্য প্রচারের বিলবোর্ডে পরিণত করেছে। আর স্বাধীনতাবিরোধী যুদ্ধাপরাধীরা একে তাদের পুনর্বাসনের জাল দলিলে পরিণত করেছে। উড়ে এসে জুড়ে বসা অন্তর্বর্তী সরকার একে তাদের খায়েশপূরণের রিসেট বাটনে পরিণত করেছে চেয়েছিল। এখন পুরোনো বিলবোর্ডে রং করার কাজ চলছে।

প্রশ্ন হচ্ছে, বারবার শাসকেরা এগুলো কেন করতে পারল? যদি জনগণের শক্তি—কৃষক-শ্রমিক, ছাত্র-নারীর শক্তি—একটি আদর্শবাদী, প্রগতিশীল বিপ্লবী রাজনৈতিক শক্তি সারা দেশের গ্রামগঞ্জে, শহরবন্দরে, কলকারখানায় সব জায়গায় ঝুঁটির মতো দাঁড়াতে পারত, তাহলে শাসকগোষ্ঠীর পক্ষে মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত চেতনা বাস্তবায়নের বদলে চেতনা বাণিজ্য করা সম্ভব হতো না।

স্বাধীনতার আগের সমস্ত গণ আন্দোলন এবং স্বাধীনতা-পরবর্তী ৫৫ বছরের রাজনীতির ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিয়ে সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট ষষ্ঠ সম্মেলন করছে। জনগণের প্রত্যাশা যে, তারা ইতিহাসের শিক্ষা ও অভিজ্ঞতায় এগোবে, যাতে জনগণের সংগ্রাম-পরিশ্রমের ফসল লুটেরা গোষ্ঠী আত্মসাৎ করতে না পারে। তারা বিপ্লবী দলের নেতৃত্বে প্রতিবাদ-প্রতিরোধের মশাল জালিয়ে শক্তিশালী অবস্থান নিয়ে শিক্ষা আন্দোলনের পাশাপাশি সর্বস্তরের শোষিত মানুষের পাশে দাঁড়াবে; যাতে ভবিষ্যতে মানুষের স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়ন হয়।

কমরেড খালেকুজ্জামান বলেন, ইদানীং একটা কথা চালু হয়েছে—ইনকুসিভনেস বা অন্তর্ভুক্তিমূলক ব্যবস্থা। সেটা কী? ৫ ভাগ মানুষের খোঁয়াড়ে ৯৫ ভাগ মানুষকে ঢুকিয়ে দেওয়া। এই ইনকুসিভ আমরা মানি না। বিপরীতে আমরা বলি, ৯৫ ভাগ মানুষের মধ্যে দূরত্ব কমিয়ে—শ্রমিকের সাথে কৃষকের, কৃষকের সাথে ছাত্র-মধ্যবিত্তের, ছাত্র-তরুণ, নারী তথা শোষিত মানুষের পরস্পরের মধ্যে দূরত্ব কমিয়ে আমরা সত্যিকারের জনতার ইনকুসিভনেস তৈরি করব।

এখন একটা সুবিধাবাদী কথা চালু হয়েছে। কী? রাজনীতিতে নাকি শেষ কথা নাই। তাহলে কি কোনো নৈতিক অবস্থান বলে কিছু থাকবে না? নীতি-আদর্শের প্রশ্নে অবশ্যই শেষ কথা আছে। এই কথার আড়ালে আছে নীতিহীন সুবিধাবাদ ও স্বার্থান্বেষী অবস্থান। সুবিধাবাদীরা নিজেদের সুবিধার জন্য নীতি ত্যাগ করে, আর অজুহাত হিসেবে বলে—'রাজনীতিতে তো শেষ কথা নাই।' দেশপ্রেম, মানুষের প্রতি ভালোবাসা, সততা, ৯৫ ভাগ মানুষের স্বার্থ রক্ষা, মানবিকতার কথা বলে—এর বিপরীতে আমি যেতে পারি না। এখানে শেষ কথা আছে। আর নীতি বাস্তবায়নে পরিস্থিতি সাপেক্ষে কৌশলের

পরিবর্তন হয়। অর্থাৎ নীতি বাস্তবায়ন করতে হলে সময় পরিবর্তনের সঙ্গে কৌশল পরিবর্তন করতে হয়। কিন্তু নীতির সঙ্গে অসামঞ্জস্য কৌশল হচ্ছে অপকৌশল। তা আমরা গ্রহণ করতে পারি না।

বামপন্থিরা যখন বৈষম্য দূর করার নীতির কথা বলে, তখন আর যুক্তি করতে না পেরে একটা কথা চালু করে দেওয়া হয়েছে যে, বামপন্থিরা শুধু দল ভাঙে। আমরা বলি, শুধু ভাঙা দেখেন, গড়া দেখেন না। ভাঙা যেমন আছে, গড়াও আছে। আবার সব ভাঙন একরকম নয়। কিছু ভাঙন বিনাশ করে দেয়, কিছু ভাঙন নবনির্মাণ করে। ১৯১২ সালে রাশিয়ার বলশেভিক পার্টি দুই ভাগে ভাগ হয়ে বলশেভিক ও মেনশেভিক হয়েছিল। ওই ভাগের ৫ বছর পর বলশেভিক পার্টি বিপ্লব করেছিল। আবার ইউরোপের অনেক পার্টি ভাঙনের মধ্য দিয়ে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। পুরোনো ভুলের আবারে থাকা নাকি সঠিকতার লক্ষ্যে নতুন পথ বেছে নেওয়া—এটাই হওয়া উচিত বিতর্কের বিষয়। হাত থেকে ডিম পড়ে ভাঙলে ডিম নষ্ট হয়, আবার মুরগি তা দিয়ে ডিম ফুটালে নবজীবনের আবির্ভাবও হয়। ফলে, সুনির্দিষ্ট পরিস্থিতি ও ঘটনার সুনির্দিষ্ট বিচার দরকার।

১৯৬২ সালে শিক্ষা আন্দোলনে আমরা যুক্ত হয়েছিলাম। এরপর স্বাধীনতা এসেছে, স্বাধীনতার পর ৫৪ বছর পার হয়েছে, শিক্ষার দাবিপূরণ হয়নি। আন্দোলনের মধ্যে জেগে ওঠা শিক্ষার দাবিকে সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট এক স্লোগানে নিয়ে এসেছে—সর্বজনীন, বিজ্ঞানভিত্তিক, সেকুলার, বৈষম্যহীন একই পদ্ধতির গণতান্ত্রিক শিক্ষা চাই। শাসকগোষ্ঠী অখণ্ড শিক্ষার দাবি ও ব্যবস্থাকে প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করে চালু রেখেছে। এর ফলাফল হচ্ছে, মাদ্রাসা শিক্ষা মানুষকে নিয়ে যায় মধ্যযুগে, ইংরেজি মাধ্যম টানে ইউরোপ-আমেরিকার দিকে, আর সাধারণ শিক্ষা অসাধারণ দৈন্যদশায় নিম্নমুখী হয়ে শিক্ষা-বাণিজ্য, ড্রপআউট আর জ্ঞানবর্জিত ডিগ্রি বিতরণ ব্যবস্থায় পরিণত হয়েছে।

বিদ্বজ্জন জানেন এবং মানেন যে, স্বায়ত্তশাসন ও গবেষণা ছাড়া কোনো বিশ্ববিদ্যালয় হয় না। এখন পাবলিক-প্রাইভেট মিলে দেশের ১৭১টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে মাত্র ৪টিতে নামমাত্র স্বায়ত্তশাসন আছে। শিক্ষার প্রাথমিক ভিত্তি যে স্কুলে, তাদের ৪০-৬০ ভাগ প্রাইমারি-মাধ্যমিক স্কুলে প্রধান শিক্ষক, সহকারী শিক্ষকের পদ খালি। নিয়মিত ক্লাসবর্জিত পরীক্ষা এবং ব্যবসায়িক কোর্স চলছে ক্রমবর্ধমান হারে। শিক্ষা হয়েছে বাণিজ্যের পণ্য।

শিক্ষাকে বিজ্ঞানভিত্তিক তো করাই হলো না; বরং একদল এখন আবার বলছেন, আমাদের সাহিত্য এবং সংস্কৃতিকে মুসলমানি করাতে হবে। এরা রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিতে চায়, কারণ রবীন্দ্রনাথ হিন্দু। নজরুলের ডিএনএ পরীক্ষা চলছে। নজরুল কত শতাংশ মুসলমান আর কত শতাংশ হিন্দুয়ানি—তার হিসাবনিকাশ চলছে। এগুলো প্রশ্ন দিলে আমাদের অনেক কিছু হারিয়ে যাবে। বাংলা সাহিত্য রচনায় রবীন্দ্র-নজরুল-সহ শিল্পী-সাহিত্যিকেরা সাহিত্য-সংস্কৃতির এক ভূবন রচনা করে গেছেন। আমরা তাকে আত্মস্থ করে আরও এগোতে চাই। আমাদের সংকল্প হওয়া উচিত ছিল যে, আমরা রবীন্দ্রনাথকে অতিক্রম করতে চাই। এখন পর্যন্ত তাঁর ধারেকাছেও আমরা পৌঁছাতে পারলাম না; কীভাবে অতিক্রম করব? সাহিত্য-সংস্কৃতির পরিমণ্ডল একদিনে গড়ে ওঠে না। বহু মানুষের সৃষ্টির অবদানে, যুগ যুগ ধরে লালনের ফলে মানুষের অগ্রসর মানবিক মননজগৎ তৈরি হয়। রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিতে গিয়ে একদলের অবস্থা আমরা দেখছি। তারা ১০টা কথা বললে—৪টা হয় গালি, ৩টা হয় নোংরা অন্ত্রীল কথা। কারণ তারা সভ্যতার ভাষা হারিয়ে ফেলেছে, মানবিকতার মূল্যবোধ হারিয়ে ফেলেছে।

সাংস্কৃতিক দিক থেকে দেউলিয়া হয়ে পড়ছে।

গণতান্ত্রিক অধিকার ও সমাজ প্রতিষ্ঠা না করে এখন বুর্জোয়াশ্রেণি সাম্প্রদায়িকতা নিয়ে আসছে। সামন্ত যুগে বুর্জোয়ারা সাম্প্রদায়িকতাকে পরাস্ত করে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিল। পুঁজিবাদ যখন সাম্রাজ্যবাদে উন্নীত হয়েছে, তখন সে আর এককালে নিজের সৃষ্ট প্রগতির পথে হাঁটতে পারছে না, এগিয়ে যেতে পারে না। তাই পুরোনো সব আবর্জনা আবার নতুন করে তুলে আনছে। এখন পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদীরা অর্থনৈতিকভাবে নজিরবিহীন সংকটে পড়ে দিশাহারা; মানুষের দাবিকে আড়াল করতে তাই তারা ধর্ম ব্যবহার করছে। সাম্প্রদায়িকতার মাধ্যমে মানুষকে বিভক্ত করছে, উগ্র জাতীয়তাবাদকে উসকে দিচ্ছে। সাম্প্রদায়িকতার প্রতিযোগিতায় নামলে বড়ো সাম্প্রদায়িক শক্তির কাছে ছোট সাম্প্রদায়িক শক্তি হেরে যাবে। তাহলে সাম্প্রদায়িকতা কী দিয়ে মোকাবিলা করবেন? করতে হবে অসাম্প্রদায়িকতা দিয়ে, বিজ্ঞান দিয়ে। পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদকে মোকাবিলা করতে হবে সমাজতন্ত্র দিয়ে, সাম্য চেতনা দিয়ে। বাংলাদেশের সাম্প্রদায়িকতা দেখিয়ে পশ্চিমবঙ্গকে বিজেপি দখলে নিয়েছিল। স্বাধীন স্বকীয় সত্তা নিয়ে বাঁচতে হলে আমাদের বুঝতে হবে যে, পুঁজিবাদী শক্তি দিয়ে সাম্রাজ্যবাদকে মোকাবিলা করা যাবে না। সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদকে মোকাবিলা করতে গেলে সমাজতন্ত্র লাগবে।

গত শতাব্দীতে বিশেষত, ১৯২৮ থেকে ১৯৩৯ সালের মহামন্দা (Great Depression) পরবর্তীতে আরও কয়েকটি আর্থিক সংকট সারা পৃথিবীতে দেখা দেয়; তখন সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েতকে সেটা স্পর্শ করেনি। এখন কিউবা দেখাচ্ছে, সমাজতন্ত্রের শক্তিতে চরম প্রতিকূলতা ও সাম্রাজ্যবাদ সৃষ্ট দূরবস্থার মধ্যেও সে কীভাবে লড়ছে।

পুঁজিবাদের নেতা যেহেতু সাম্রাজ্যবাদ, পুঁজিবাদকে তো তাদের আদেশ-নির্দেশ মানতে হয়। যাদের গরু-ছাগল পালার যোগ্যতা নাই, তারা হাতি কিনতে গেলে কী অবস্থা দাঁড়ায়? আমাদেরও একই অবস্থা। আমাদের ঘাড় ধরে বোয়িং বিমান, এয়ারবাস, যুদ্ধবিমান কিনতে বাধ্য করছে। আমরা কেন মেনে নিলাম? নিলাম তাদের অনুগ্রহে ক্ষমতায় থাকার মোহে। এভাবে পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদের শৃঙ্খলে শ্রমজীবী মানুষকে হাত-পা বেঁধে শোষণ বলবৎ রাখা হচ্ছে।

আরেকটা সমস্যা হচ্ছে, অপরাধ বাড়ছে। পুঁজিবাদী শোষণ যত তীব্র হবে, অপরাধ তত বাড়বে। পুলিশ দিয়ে অপরাধ দূর করা যাবে না। যদি তা সম্ভব হতো, তাহলে পুলিশ তো আছেই; কিন্তু অপরাধ কমছে না কেন? যদি এক কোটি মানুষকে চাকরি দেওয়া যায়, তাহলে ৭০ ভাগ অপরাধ কমে যাবে। পুলিশ বাড়লে অপরাধ কমে না; বরং রাষ্ট্রের বোঝা আরও ভারী হবে। মানুষের অধিকার বাড়লে অপরাধ কমে। শিক্ষা-স্বাস্থ্যসেবার অধিকার, নাগরিক অধিকার নিশ্চিত করতে না পারলে অপরাধ কমে না। ঘটনা করে হকার উচ্ছেদ করছেন, কিন্তু কেন হকার সৃষ্টি হয় তা দূর করার পদক্ষেপ না নিলে এরা যাবে কোথায়? যে দেশের মানুষ জীবন দিয়ে দেশ স্বাধীন করেছে, তাদের অনেকে এখন বলছেন, এ দেশ বসবাসের উপযোগী নয়—এর চেয়ে অপমানের আর কী হতে পারে?

'৭১ সালে যুদ্ধ চলাকালে আমেরিকা সপ্তম নৌবহর পাঠিয়েছিল—আমরা বলেছি, প্রয়োজন হলে আমরা ৪০ বছর যুদ্ধ করব, কিন্তু সাম্রাজ্যবাদের কাছে নতজানু হব না। এই চেতনায় সেদিন যুদ্ধ হয়েছে। আর আজকে ওরা আমাদের ঘাড় ধরে, আমরা ওদের পা ধরি।

এর পর পৃষ্ঠা ৪ কলাম ১

চারণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের কেন্দ্রীয় কাউন্সিল অনুষ্ঠিত

সাংস্কৃতিক আন্দোলন সমাজ
বদলের অন্যতম হাতিয়ার
কমরেড খালেকুজ্জামান

চারণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের কেন্দ্রীয় কাউন্সিল ১২ সেপ্টেম্বর ঢাকায় ভ্যানগার্ড মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। সংগঠনের কেন্দ্রীয় সভাপতি নিখিল দাসের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক জাকির হোসেনের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত কাউন্সিলে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন, বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির উপদেষ্টা কমরেড খালেকুজ্জামান।

কমরেড খালেকুজ্জামান বলেন, সাংস্কৃতিক আন্দোলন সমাজ বদলের অন্যতম হাতিয়ার। চারণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের দ্বিতীয় কাউন্সিলে উপস্থিত সকল কমরেডদের আন্তরিক শুভেচ্ছা। আপনারা জানেন, সংস্কৃতি মানুষকে প্রাণীসত্তা থেকে মানবিক সত্তায় উত্তরণের অন্যতম বাহন। মানব শরীরের ক্ষয়পূরণ ও পুষ্টিসাধনের জন্য আহাৰ প্রয়োজন, তেমনি মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য শিল্প-সংস্কৃতি চর্চা ও পরিচর্যা প্রয়োজন। কারণ সমাজবদ্ধ মানুষ সমাজের মানসিক ও মানবিক স্বাস্থ্যের আবহাওয়ার মাঝেই স্বকীয় সত্তা লাভ করে। আবার চিন্তা করার ক্ষমতাপ্রাপ্ত মানুষ বস্তুগত উৎপাদনের সিঁড়ি বেয়ে সমাজ-সভ্যতা নির্মাণের ক্ষেত্র রচনা করে, পাশাপাশি ভাবগত উৎপাদনের বহুমুখী ধারার বিকাশের ক্ষেত্রও তৈরি করে। শ্রেণিতে ভাগ করা সমাজে তা শ্রেণিস্বার্থ ও শ্রেণিভাবনার গণ্ডি অতিক্রম করতে পারে না। এইভাবে আর্থব্যবস্থা থেকে উদ্ভূত রাজনীতি ও সংস্কৃতি পরস্পর দ্বন্দ্বিক সম্পর্কে সম্পর্কিত। রাজনৈতিক সংগ্রাম প্রগতির পথ হারিয়ে ফেললে সংস্কৃতি স্থবির দশায় পতিত হয়। সাংস্কৃতিক বহুমুখী প্রকাশের শাখা-প্রশাখাগুলো বদ্ধতায় আটকে গেলে রাজনৈতিক সংগ্রামের প্রগতিমুখী ধারাও গতি হারায় কিংবা বিপথগামী হয়। সংস্কৃতি জীবনের পূর্ণতা দেয়, রাজনীতি তার উপায় করে দেয়। আদিম গোষ্ঠীবদ্ধ সমাজে সংস্কৃতির বহু উপাদান যুক্ত হতে হতে দাসসমাজ, সামন্তসমাজ অতিক্রম করে পুঁজিবাদী সভ্যতায় উত্তরণকালে বিশাল ব্যাপ্তি নিয়ে উপস্থিত হয়।



পুঁজিবাদ অবাধ প্রতিযোগিতার যুগ পেরিয়ে একচেটিয়ায় প্রবেশকালে তার উত্থানের অনেক প্রতিশ্রুতি থেকে পিছিয়ে যেতে থাকে; আর বর্তমান সাম্রাজ্যবাদী বিশ্ব-পুঁজিবাদী ব্যবস্থারকালে প্রায় সবটাই নিঃশেষিত হওয়ার পথে। অর্থাৎ এখন অঙ্গীকারের মুখোশ আছে, প্রাণ নেই। এই সময় সমাজতন্ত্র-সাম্যবাদের লক্ষ্যাভিমুখী রাজনৈতিক সংগ্রামের মাঝেই অগ্রসর সংস্কৃতিচেতনা, ভাবনার নতুন চেহারা দাঁড়াতে পারে। আমাদের দেশের বাস্তবতায় বিপ্লবী পার্টির পরিচালনায় চারণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্র সে জাগরণ ঘটাতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, যা চরম হতাশার ঘোর অন্ধকার সময়ে আশার প্রদীপ জ্বালাতে পারে।

কমরেড খালেকুজ্জামান আরও বলেন, আমাদের দল ১৯৮০ সালে গঠিত হওয়ার পর সাংস্কৃতিক সংগঠনের নাম ছিল ‘বীকন’। অর্থাৎ জাহাজের সার্চলাইট, যা অন্ধকারে আলো ফেলে গন্তব্যপথ দৃশ্যমান করে। পরে বাংলাদেশের গ্রামেগঞ্জে, শহরেনগরে, শিল্পাঞ্চলে, মাঠেময়দানে, আনাচেকানাচে সর্বত্র চারণিক দল সংস্কৃতির বীজ বপন করবে, সংস্কৃতির আবহাওয়া ও পরিবেশ গড়ে তুলবে, যা বিপ্লবী রাজনীতির পরিপূরক হয়ে গণমানুষের মধ্যে রসসিক্ত, উদ্যমী প্রাণ-প্রাচুর্য সৃষ্টি করবে—সেই লক্ষ্যে চারণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের আবির্ভাব। আমাদের পার্টির ৫টি ফ্রন্ট, যথা : সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্ট, সমাজতান্ত্রিক ক্ষেত্রমজুর ও কৃষক ফ্রন্ট, সমাজতান্ত্রিক মহিলা ফোরাম, চারণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্র ও সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট মিলে সমাজের সর্বস্তরের শোষিত

শ্রমজীবী মানুষের কর্মক্ষেত্রকেন্দ্রিক ভিন্নতা ও বহু বিচিত্র ধরনের জীবনযাত্রা, ভাবনা ও সংগ্রামের সফলতা-ব্যর্থতার অভিজ্ঞতাসমূহকে পার্টি যৌথ জ্ঞানভাণ্ডারে পরিণত করে এবং ফ্রন্টসমূহ যার যার নিজস্ব ক্ষেত্রে নানামুখী কর্মপ্রয়াসে ক্রিয়াশীল হয়। এখানে ব্যক্তির বিচ্ছিন্ন কর্মকাণ্ড বা ব্যক্তি-প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য বা ঝোঁক প্রাধান্য পায় না। কারণ অটল সম্পদ আর প্রচুর টাকা দিয়েই শুধু পুঁজির চরিত্র মাপা যায় না। পদ-পদবি, নাম-ধাম, খ্যাতি সুনাম ইত্যাদি কর্তব্য পালনের উপরিপাওনা না হয়ে যখন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর একান্ত বিষয় হয়ে ওঠে, তখনই তা পুঁজির চরিত্র ধারণ করে। অতীতের বহু বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতা সে সাক্ষ্য বহন করে।

তিনি আরও বলেন, চারণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্রকে পূর্ণতায় দাঁড় করিয়ে অপরাপর সাংস্কৃতিক সংগঠন, আন্দোলনের সাথে যৌথ প্রচেষ্টায় সমাজ বিপ্লবের লক্ষ্যে রাজনৈতিক সংগ্রামের পরিপূরক সাংস্কৃতিক আন্দোলনের হাতিয়ারে পরিণত করার যে সংকল্প নিয়ে আপনারা নিজ নিজ ক্ষেত্রে নামবেন, তা সংস্কৃতি ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনে এক নতুন মাত্রা যোগ করবে, সন্দেহ নেই। চারণের ক্ষেত্র অনেক বিস্তৃত; যেমন : ভাষা-সাহিত্য, সংগীত-নৃত্যকলা, ছবি আঁকা, অভিনয়, নাটক-সিনেমা, যাত্রাপালা, লোকগান, বাদ্য-বাজনা, আবৃত্তি, শরীরচর্চা, খেলাধুলা ইত্যাদি। এর জন্য প্রয়োজন নিয়মিত পাঠচক্র ও পাঠাভ্যাস, পার্টি ও ফ্রন্টসমূহের পত্রিকাসহ প্রচারপত্রিকা, দল-ঘনিষ্ঠতা, দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা সংস্কৃতিকর্মী, লেখক-

সমালোচক, সংগঠন ইত্যাদির সাথে যোগাযোগ করে তাদের কাছ থেকে শিক্ষা-অভিজ্ঞতা ও তাদের সীমাবদ্ধতা চিহ্নিতকরণ, অতীতের সংস্কৃতি ভাণ্ডারের সাথে পরিচয়, বিশ্বপরিসরে সাহিত্য-সংস্কৃতির ধারা অনুসন্ধান ইত্যাদি। চারণ অফিসকে সাংস্কৃতিক লাইব্রেরিসহ অনেকটা আখড়ার মতো করে গড়ে তুলতে হবে। প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাকে ধাপে ধাপে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতায় তুলতে হবে। অপসংস্কৃতি, পশ্চাৎপদ-প্রতিক্রিয়াশীল ধ্যানধারণা, কৃপমগ্ন চিন্তা ধর্মপালনের নীরব ব্যক্তিগত সীমা ছাড়িয়ে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, প্রতারণামূলক স্বার্থসুবিধা লাভের মুখোশ উন্মোচন, সেমিনার ইত্যাদি আয়োজন যুক্তভাবে ও নিজস্ব সাংগঠনিক উদ্যোগে করে যেতে হবে। অতীতের সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ইতিহাসের সাথেও আমাদের পরিচয় দরকার, যাতে মূল্যায়ন করা যায়—এ সমস্ত সংগঠন-আন্দোলন কতটা সমরোপযোগী অসাধারণ কর্তব্য সম্পাদন করেছে, আবার পরবর্তী পরিস্থিতিতে সে ধারাবাহিকতা কেন রক্ষা করতে পারেনি, সাংগঠনিক অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখা যায়নি। ১৯৩৫ সালে রম্মা রোলা ও মাল্লিম গোর্কিনদের উদ্যোগে অ্যান্টি-ফ্যাসিস্ট ইন্টারন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন অব রাইটার্স, ভারতীয় প্রগতি লেখক সংঘ, ঢাকার প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘ, লেখক শিবির, ভারতীয় গণনাট্য সংঘ, সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট এবং বর্তমানে গণতান্ত্রিক সাংস্কৃতিক ঐক্য ইত্যাদি। এ সবারই মূল্যায়ন-পুনর্মূল্যায়ন দরকার; যাতে সমাজতন্ত্র-সাম্যের লক্ষ্যে চারণ সুদীর্ঘকাল তাৎপর্যপূর্ণ ও প্রাসঙ্গিকভাবে ক্রিয়াশীল থাকতে পারে। বিপ্লবী পার্টিসংযোগে ও পরিচালনায় তা কার্যকারিতা লাভ করে এগিয়ে যাবে। হারিয়ে যাওয়া সংস্কৃতি নতুন সুরে বেজে উঠবে রাজনৈতিক সংগ্রামের নবপ্রদর্শন আর দ্বোগানের প্রাণস্পন্দনে।

কাউন্সিলে নির্বাচিত কমিটি পরিচয় করিয়ে দেন কমরেড খালেকুজ্জামান। কাউন্সিলে, নিখিল দাসকে সভাপতি ও জাকির হোসেনকে সাধারণ সম্পাদক, এবং শাহজাহান কবীব, কামরুজ্জামান ভূঁইয়া খোকন ও আব্দুল্লাহ আল মামুন তাজুকে সহসভাপতি করে ২০ সদস্যবিশিষ্ট চারণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের কেন্দ্রীয় কমিটি ঘোষণা করেন।

কার্যকর সমাধানের লক্ষ্যে সমস্যার মূলে যেতে হবে, নইলে দুর্গতি কমবে না

প্রথম পৃষ্ঠার পর

করপোরেট হাউসের যোগ্য সেবাকর্মী হওয়ার কথাই প্রাধান্যে আসে। একশত জন মানুষের মধ্যে ৫০ ভাগ দরিদ্র; গত এক বছরে নতুন করে ২১ লাখ মানুষ দরিদ্রসীমার নিচে নেমে গেছে। অন্যদিকে ৬-৭ মাসে ২২ হাজারের উপরে কোটিপতি হয়েছে। আপেল-মাল্টা ইত্যাদি ফল আমদানি খরচ কেজিতে যদি হয় ৭০-৮০ টাকা বাজারে ৪৫০-৫০০ টাকা। মাছ-মাংস তো দূরের কথা, শাকসবজি, তরিতরকারিতে হাত দেওয়াও কঠিন। কর্মসংস্থান নাই বললেই চলে, অন্যদিকে ছাঁটাই রয়েছে অব্যাহত।

বেকারত্ব এবং অপরাধ পাল্লা দিয়ে চলছে ক্রমবর্ধমান হারে। চিকিৎসা ব্যবস্থারই এখন চিকিৎসা প্রয়োজন। দেশের প্রধান সরকারি বিশেষায়িত ক্যান্সার হাসপাতালে রেডিওথে রাপির জন্য অপেক্ষমাণ রোগীর সংখ্যা ৭ হাজার ছাড়িয়েছে। কোন কোন রোগীর সিরিয়াল পড়েছে ২০২৮ সালের শেষভাগে (বণিক বার্তা, ৩ অক্টোবর, ২০২৬)। ৮ মাসে ৩৬ নিখোঁজ শিশুর লাশ উদ্ধার। অন্যদিকে সারা দেশে ৩৮৬ কিশোর গ্যাংয়ের ৪ হাজারের বেশি সদস্য। ঢাকা মহানগরে ১৫৯ সদস্য (বণিক বার্তা, ২৩ সেপ্টেম্বর ২৬)। এই সংখ্যা বৃদ্ধি

ও মাদকাসক্তির দলভারি হওয়া পরিবারের অভিভাবকদের মধ্যে উদ্বেগ বাড়ছে। ৮ মাসে ২২৪ শিক্ষার্থী আত্মহত্যা করেছে। ১৩ অক্টোবর ডেইলি স্টার পত্রিকা জুলাই-সেপ্টেম্বর মাসের সহিংস চিত্র প্রকাশ করে একটি গবেষণার বরাত দিয়ে লিখেছে, এই সময়ে ২৫৩ নারী ধর্ষিত হয়েছে। এর মধ্যে ১২ জনকে ধর্ষণ ও হত্যা করা হয়েছে, ১ জন আত্মহত্যা করেছে। ২২০ নারী যৌন হয়রানির শিকার, তার মধ্যে ১০৩ শিশু। যৌতুক আদায় সন্ত্রাসে ১৩ নারী হত্যা, ১৭ আহত ও ২ জন আত্মহত্যা করেছে। পারিবারিক সংঘাতে ১৩৭ নারী নিহত, ৬৮ আহত এবং ৭২ জন আত্মহত্যা করেছেন। শারীরিক-মানসিক নির্যাতনে ৭৩৩ শিশুর মধ্যে ১৮৯ জনের মৃত্যু, ৫৪৪ জন লালিত। রাজনৈতিক সংঘাতের ১৮৩ ঘটনায় ১৭ জনের মৃত্যু, ১ হাজার ২২৭ জন আহত; বিএনপির অভ্যন্তরীণ কোন্দল ও অন্যদের সাথে বিরোধে।

বিএনপি দলের ৬৯টি অভ্যন্তরীণ বিরোধে ৯ জনের মৃত্যু, ৫৪০ আহত। বিএনপি-জামায়াত ৪১টি সংঘাতে ১ জনের মৃত্যু, ৩৩৮ জন আহত। মব সন্ত্রাসে ৫৪ মৃত্যু, ১৪৫ আহত ১৩৭টি ঘটনায়। কারাগারে ৩৭ মৃত্যু। এর মধ্যে ১৪ জন সাজাপ্রাপ্ত, ২৩ জন বিচারধীন। নিরাপত্তা হেফাজতে নির্যাতনে ৬ জনের মৃত্যু।

আইনশৃঙ্খলা রক্ষাবাহিনী ১৮টি সভা ও মিছিলে বাধা দিয়ে হামলা করে ১২৮ জনকে আহত, ৮ জনকে গ্রেপ্তার করেছে। ৮৮টি ঘটনায় ১৩৫ সাংবাদিক হেনস্তার শিকার, যার মধ্যে ৬৩ আহত, ২৭ জন অপদস্থ, ৯ জনকে মৃত্যুভয় দেখানো হয়েছে। কর্মস্থলে ১৬৪ শ্রমিক নিহত নিরাপত্তাহীনতা ও যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে। ২৫১ ঘটনায় শ্রমিক নির্যাতনে ৭১ জন নিহত, ২৬০ জন আহত। ১ গৃহকর্মী খুন, ৩ জনের মৃত্যু রহস্যজনক, যার মধ্যে ২ জন শিশু। সংখ্যালঘুদের উপর ৬টি সহিংস ঘটনায় আহত ৬ জন। ২টি মন্দির, ৫টি প্রতিমা ভাঙচুর এবং ৪টি বাড়িতে লুটপাট হয়েছে।

ধান উৎপাদনে কৃষকের ব্যয়—বীজ-সার, কীটনাশক, সেচ-শ্রম ও জমি প্রস্তুত ইত্যাদির খরচ ৫ বছরে ২৫% বেড়েছে। অথচ ফসলের সঠিক মূল্য এবং বাজারমূল্য কোনোটাই কৃষক পায় না। উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত যারা তারা ন্যায্য পাওনা পায় না আর মধ্যস্থত্বভোগীরা বিনা শ্রমে পুঁজি বাড়ায়। পরিবারে-সমাজে, রাষ্ট্রে, প্রশাসনে, আইনকানুনে, বিধিবিধানে, সম্পর্ক-সম্বন্ধে, সর্বক্ষেত্রে মুষ্টিমেয়ের উন্নতি আর গরিষ্ঠ জনতার অবনতি।

এর উৎস যে পুঁজিবাদ আর এর প্রতিকার যে পুঁজিবাদ উচ্ছেদের সংগ্রামের মাঝে নিহিত,

এ বোধের উদয় না হওয়া পর্যন্ত সুদিনের স্বপ্ন জাগবে না, মানুষের মধ্যে উন্নত সামাজিক বন্ধন ও সাংস্কৃতিক জাগরণ ঘটবে না। সাংস্কৃতিক অবক্ষয় যে সভ্যতার ক্ষয় ঘটায়, তা অনেক নগ্নরূপে প্রকাশিত হলেও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের তাগিদ তৈরি হচ্ছে না। এই সর্বগ্রাসী অবক্ষয়ের হাত থেকে মুক্তি পেতে চাইলে প্রগতিশীল রাজনীতি ও তার পরিপূরক অগ্রসর সংস্কৃতি ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের বিকল্প নেই। সেই সংগ্রামের, অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদ বিরোধী সংগ্রাম ও তার পরিপূরক সাংস্কৃতিক আন্দোলনই কাক্ষিত ভবিষ্যৎ নিকটবর্তী করবে। সমাজের এবং নিজের জীবনের সংকট দেখে হাহাকার করলে সমাধান ও স্বস্তি আসবে না। প্রয়োজন সমস্যা সমাধানে প্রতিরোধ আন্দোলন। বাসদ আগামী দিনে সেই সংগ্রামকে মুখ্য এবং প্রধান করে তুলতে বন্ধপরিকর। প্রয়োজন সামাজিক শক্তির সক্রিয় অংশগ্রহণ। তাই আমরা আহ্বান জানাই, আসুন বহু আন্দোলনের অভিজ্ঞতায় গণমানুষের আকাজক্ষা পূরণের সংগ্রামে এগিয়ে আসি। মানবমুক্তির সত্যিকার শক্তি বাসদ ও বামপন্থাকে দৃশ্যমান করি। শোষণ বৈষম্যের অবসান ঘটাতে তাই সব বাম গণতান্ত্রিক প্রগতিশীল শক্তির প্রতিও আহ্বান, মূল লক্ষ্যে পৌঁছাতে আসুন ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম এগিয়ে নেই।

যুবসমাজের চরিত্র নষ্ট না করতে পারলে পুঁজিবাদ টেকানো যাবে না; উলটা দিক থেকে যুবসমাজের নৈতিক জাগরণ ঘটাতে না পারলে সমাজ বিপ্লবও হবে না

দ্বিতীয় পৃষ্ঠার পর

গণ অভ্যুত্থানের পর মানুষ হতাশ হয়েছে ক্ষমতাসীনদের কর্মকাণ্ড দেখে। কিন্তু এই শিক্ষা ভুলে গেলে চলবে না যে, গণ আন্দোলনের জন্য সংস্কৃতি লাগে, শিক্ষা লাগে, আদর্শ লাগে, নেতৃত্ব লাগে। সঠিক আদর্শ, সংস্কৃতি-শিক্ষা, নেতৃত্ব না থাকলে গণ আন্দোলনের শৌর্য তৈরি হয় না, উচ্ছৃঙ্খল গোষ্ঠীর মব-সন্ত্রাস তৈরি হয়। একটা মানুষকে দায়বদ্ধ করে, আরেকটা মানুষকে ভীতসন্ত্রস্ত করে। একটা অন্যায়ের বিরুদ্ধে মানুষের বিবেককে বিকশিত করে, অন্যটা ব্যক্তির স্বার্থ উদ্ধারের হাতিয়ারে পরিণত হয়। আন্দোলনের সামনে যারা থাকে, তারা যদি আদর্শহীন, লোভী, সুবিধাবাদী এবং শোষকগোষ্ঠীর অন্তর্গত হয় তা হলে অনেক অর্জন বিসর্জনে যায়। এতে সামনে উদ্দেশ্যহীন বেপরোয়া মনোভাব সমাজের মধ্যে তৈরি হয়ে যায়।

নারী-শিশুরা সমাজে কতটা নিরাপদ এবং মর্যাদার অধিকারী ও বৈষম্যহীন কর্ম ও জ্ঞান লাভে উন্মুক্ত—সেটা দিয়ে সভ্য সমাজের মানদণ্ড পরিমাপ করা হয়। '৭১ সালে মা-বোনদের ইজ্জত রক্ষার জন্য তরুণ-যুবকেরা জীবন দিয়েছে; আজকে কিশোর গ্যাং নারী-শিশু ধর্ষণ-খুনের মতো অপরাধ করেছে। মাদক, পর্ন ইত্যাদিতে আসক্তি বাড়ছে। যে সাংস্কৃতিক মানে, আদর্শবোধে, নৈতিক জাগরণে এই জাতি একদিন দাঁড়িয়ে ছিল, ৫৫ বছরে শাসকগোষ্ঠী জাতিকে কোথায় নামিয়েছে—এগুলো তারই প্রকাশ।

কমরেড খালেকুজ্জামান আরও বলেন, কিছুদিন ধরে আলোচনায় আসছে—স্থানীয় সরকার নির্বাচন হবে। স্থানীয় সরকার বলতে বাস্তবে বাংলাদেশে কিছু নাই। সংবিধানে কী আছে দেখেন—চতুর্থ ভাগের তৃতীয় পরিচ্ছেদে বলা আছে 'স্থানীয় শাসন'। ধারা ৫৯। (১) 'আইনানুযায়ী নির্বাচিত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত প্রতিষ্ঠানসমূহের উপর প্রজাতন্ত্রের প্রত্যেক প্রশাসনিক একাংশের স্থানীয় শাসনের ভার প্রদান করা হইবে।'

যেমন ধরি—গ্রাম, ইউনিয়ন, উপজেলা, জেলা, বিভাগ এবং কেন্দ্র। এই ছয়টি স্তরে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা শাসিত হওয়ার কথা। বাস্তবে স্থানীয় শাসনের নামে কেন্দ্রীয় শাসনের সম্প্রসারিত বাহু হিসাবে স্থানীয় শাসন চলছে। স্থানীয় শাসন, ইংরেজি অনুবাদে আছে Local Government; বাংলায় করা হয়েছে স্থানীয় শাসন। Government-এর বাংলা কী শাসন হয়? কেন্দ্রে নির্বাচিত সরকার ও পার্লামেন্ট আছে; বিভাগে আছে বিভাগীয় কমিশনার (Divisional Commissioner)। অর্থাৎ একজন আমলা বিভাগ চালান। জেলায় আছে District Commissioner; Commissioner-এর বাংলা করা হয়েছে জেলা প্রশাসক। কিন্তু Commissioner-এর বাংলা তো প্রশাসক হয় না। তিনি জেলা চালান। উপজেলায় আছে ইউএনও (UNO-Upazila Nirbahi Officer); তিনি উপজেলা চালান। ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান-মেম্বারদের বাস্তবে স্বাধীন সভা বা ক্ষমতা নেই। উপজেলা থেকে তাদের সিদ্ধান্ত অনুমোদন নিতে হয়। তাহলে বিভাগে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি নাই, জেলায়ও নাই। এগুলো সংবিধানের দুর্বলতা। কিন্তু এগুলো নিয়ে কোনো আলোচনা নাই। আছে কী? সংবিধান ছুড়ে ফেলে দাও। সংবিধান পুনঃলেখন কর—ইত্যাদি।

বিগত সরকারগুলো গণতন্ত্রকে ভোটতন্ত্র বানিয়েছে। আর অভ্যুত্থানের পরে জনগণের ক্ষমতায়নের গণতন্ত্রের বদলে শুরু হলো গোষ্ঠী-সন্ত্রাসের মবতন্ত্র। গণতন্ত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠের ইচ্ছা মান্য করা হয়, কিন্তু সংখ্যালঘু বা বিরোধীদের মত ও অধিকার সুরক্ষিত থাকে। মবতন্ত্র হচ্ছে

মুষ্টিমেয় সন্ত্রাসী শক্তিতে অন্যের অধিকার কেড়ে নেওয়া, আইনকে তোয়াক্কা না করা। এর মাধ্যমে সাধারণ মানুষের মধ্যে ভয়ের পরিবেশ তৈরি হয়; জীবন-সম্পত্তি, চলাচলের স্বাধীনতা, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা—সবই বিপন্ন হয়। আইনের শাসন ও বিচার ব্যবস্থা বলে কিছু থাকে না। এতে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় ইতিহাস-ঐতিহ্য, দেশের সংস্কৃতির ভিত ও পরিমণ্ডল, মানবাধিকার, সংখ্যালঘু, নারী-শিশু, শ্রমজীবী মানুষ।

গণতন্ত্রের ধারণা ইউরোপ থেকে এসেছে। এটা মূর্ত রূপ লাভ করেছে যুক্তফ্রন্টের আন্দোলন ও আইয়ুবের মৌলিক গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে আন্দোলনের মাধ্যমে।

ধর্মনিরপেক্ষতা—এটা নাকি আমরা ভারত থেকে নিয়ে এসেছি। ১৯৭২ সালে বাংলাদেশের সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতা কথটি যুক্ত হয়েছিল। আর ভারতের সংবিধানে আমাদের চার বছর পর ১৯৭৬ সালের ৪২তম সংশোধনী (The Constitution (Forty-second Amendment) Act, 1976) দ্বারা সংবিধানের প্রস্তাবনায় (Preamble) তিনটি শব্দ যোগ করা হয়: Socialist (সমাজতান্ত্রিক); Secular (ধর্মনিরপেক্ষ); Integrity (অখণ্ডতা)।

১৯৪৮ সালে ছাত্রলীগের প্রতিষ্ঠার পর নাম ছিল 'পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ'। ১৯৫৩ সালে 'মুসলিম' শব্দটি বাদ দিয়ে নাম রাখা হলো 'পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ'। স্বাধীনতার পর নাম রাখা হলো 'বাংলাদেশ ছাত্রলীগ'। মওলানা ভাসানির নেতৃত্বে গড়ে উঠেছিল আওয়ামী মুসলিম লীগ। ৫৫ সালে ভাসানীর সভাপতিত্বে 'মুসলিম' শব্দটি বাদ দিয়ে রাখা হয়েছে 'আওয়ামী লীগ'। তখন এ ভুখণ্ডে ধর্মনিরপেক্ষতার আকাজক্ষা গড়ে উঠেছিল বলে তারা সংগঠনের নাম থেকে 'মুসলিম' শব্দটি বাদ দিতে বাধ্য হয়েছিল। এতে সংগঠন দুর্বল না হয়ে শক্তিশালী হয়েছে। আদমজী থেকে আন্দোলনকারী শ্রমিকরা প্রথমে স্লোগান তুলেছিল—শ্রমিক ঐক্য জিন্দাবাদ। তার পরই 'দুনিয়ার মজদুর এক হও!' স্লোগান উঠে এবং পাকিস্তানি শোষক ২২ পরিবারের বিরুদ্ধে লড়াই, শোষণের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ভেতর থেকে সমাজতন্ত্র উঠে এসেছে। মওলানা ভাসানী ভাষা দিয়েছিলেন—কেউ খাবে, কেউ খাবে না; তা হবে না, তা হবে না। স্বাধীনতার পর জাসদ বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের কথা বলে ঘরে ঘরে সমাজতন্ত্রের বাণী পৌঁছে দিয়েছিল। এগুলো আমাদের জাতির সংগ্রাম থেকে উঠে এসেছে। এগুলো সংগ্রামের শিক্ষা, সংগ্রামের অর্জন, সংগ্রামের চেতনা।

আজকে সমাজে অনেকগুলো বিভ্রান্তি তৈরি হয়েছে। এই বিভ্রান্তি দূর করা আন্দোলনের শর্ত। একটা দল যদি সামনে এগোতে হয়, তাহলে তৎকালীন সময়ে যত বিভ্রান্তি আছে, সেগুলোকে মোকাবিলা করতে হয়। ১৮৪৮ সালে মার্কস-এঙ্গেলস বলেছিলেন, ইউরোপ ভূত দেখছে—কমিউনিজমের ভূত! পৌনে দুই শ বছর পর যুক্তরাষ্ট্রে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পসহ সকল শাসক বুর্জোয়ারা এখন কমিউনিজমের ভূত দেখছেন। তাদের তল্লাহবাহক প্রচার গোষ্ঠী নানাভাবে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে। সমাজতন্ত্র যেহেতু বিজ্ঞান, আর বিজ্ঞান ক্রমাগত উন্নত হয়; সকল প্রশ্নের মীমাংসা করেই সামনে এগোয়। মার্কসের চিন্তাকে আরও বিকশিত করেছেন এঙ্গেলস; পরবর্তীতে লেনিন, স্তালিন, মাও সেতুং তাকে আরও বিকশিত করেছেন। নতুন নতুন পরিস্থিতির সামনে পড়ে, সমস্যার মুখে সে চিন্তা আরও বিকশিত হবে, উন্নত হবে। সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে লাঞ্ছনা বিভ্রান্তি ছড়ানো হয়েছে, এখনো চলছে, সেটা থামবে না। কিন্তু বিজ্ঞানের যুক্তির পথেই সে মিথ্যা-বিভ্রান্তিকে আন্তর্কুণ্ডের বর্জ্য হিসেবে নিষ্ক্ষিপ্ত করবে।

শোষকের চিন্তা যত দ্রুত ছড়ায়, শোষিতের চিন্তা তত দ্রুত যায় না। কারণ মিডিয়া তাদের পক্ষে, বুদ্ধিভ্রষ্ট বুদ্ধিজীবীর দল তাদের হয়ে ভাড়া খাটে, রাষ্ট্রশক্তি তাদের হাতে। পাকিস্তান আমলে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা ছাত্রদের বৈষম্য বোঝাতেন। ছাত্রদের সামনে জ্ঞানগর্ভ বিষয় আলোচনা হতো; আর আজকে শিক্ষকদের অনেকে শাসক দলের সুবিধাভোগীতে পরিণত হয়েছেন

গণ অভ্যুত্থানে জীবন দিয়েছে শ্রমিক-কৃষক, ছাত্র, নারী-শিশু, জনগণ; আর অভ্যুত্থানের পর নেতা পরিচয়ে হাজির করা হয়েছে ক্রিন্টনের দরবারে। যারা জীবন দিয়েছে, সেই জনগোষ্ঠীর কাছে এরা যায়নি। কৃষকের কাছে, শ্রমিকের কাছে, নারী-ছাত্রদের কাছে তারা যায়নি। এরা বৈষম্যের বিরুদ্ধে কথা বলে ১৫ মাসেই যেন ১৫ বছরের লুটপাটকে ছাড়িয়ে গিয়েছে। এদের যৌবনের শক্তিকে লোভ-লালসা, ক্ষমতার দিকে ধাবিত করা হলো। গোটা যুবসমাজকে এরা বিপথগামী, লক্ষ্যভ্রষ্ট করেছে। বুর্জোয়ারা জানে, যুবসমাজের চরিত্র নষ্ট না করতে পারলে পুঁজিবাদ টেকানো যাবে না। উলটা দিক থেকে যুবসমাজের নৈতিক জাগরণ সৃষ্টি করতে না পারলে বিপ্লবও হবে না। সেই লড়াইয়ের মধ্যে আমাদের থাকতে হবে। আজ সাম্রাজ্যবাদী শক্তি দুনিয়াজুড়ে যুদ্ধের আগুন ছড়িয়ে চলছে। মার্কিন শাসক দস্যুরা নিকোলাস মাদুরো ও তার স্ত্রীকে বেডরুম থেকে তুলে নিয়ে এসেছে। তাই ভয়ে আমাদের শাসকরা আগেই মাথা বাড়িয়ে দিয়ে বসে আছে। কিন্তু মানুষ এই অপমান ও লুণ্ঠন মেনে নেবে না। তাই আজকে নতুন করে জাগরণের ঢেউ বিশ্বের দেশে দেশে দোলা দিচ্ছে। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, একটা নিপীড়নমূলক ব্যবস্থা তার ধ্বংসের আগে বড়ো ধরনের একটা ধ্বংসযজ্ঞ ঘটিয়ে ইতিহাসের মঞ্চ থেকে বিদায় নেয়। হাজার হাজার দাসকে হত্যা করে দাস ব্যবস্থা বিদায় নিয়েছে। সামন্তবাদও একই কাজ করেছে। আজকে পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদেরও অন্তিম লগ্ন। তারা ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়ে এ শতাব্দী শেষ হওয়ার আগে ইতিহাসের মঞ্চ থেকে বিদায় নেবে—সে লক্ষণই দেখা যাচ্ছে।

পলিতে গড়া বাংলাদেশ আর সংগ্রামের উত্তাপে গড়া বাংলার জনগণ—এর বাইরে থাকতে পারে না। অতীত ব্যর্থতার গ্লানি মুছে ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার পতাকা উড়াতে তরুণ-যুবসমাজ। প্রেরণা জোগাবে মানুষ, ঐক্যের বাঁধনে এগিয়ে আসবে শ্রমজীবী জনগণ। আমি সকল প্রগতিশীল ছাত্র সংগঠন, সাংস্কৃতিক সংগঠনের কর্মীবৃন্দ, প্রগতিশীল আন্দোলনের

সংগঠনসমূহকে এক কাতারে দাঁড়িয়ে শোষক এবং শোষিতের সীমারেখা টেনে দাঁড়ানোর আহ্বান জানাই। বিরোধগুলোকে বিবেচনায় রেখে ঐক্যের পথ তৈরি করতে হবে। ৯৯ ভাগ অনৈক্যকে পাশে রেখে এক ভাগ ঐক্যকে নিয়ে আসুন, আমরা মাঠের লড়াইয়ে নামি। আর বিরোধসমূহকে বৈজ্ঞানিক যুক্তিতে নিষ্পত্তি করি। সেই সংগ্রামে ছাত্র ফ্রন্টের কর্মীদের প্রেরণা যেন হয় রবীন্দ্রনাথের গানের কলি—'... বজ্রানলে আপন বুকের পাঁজর জালিয়ে নিয়ে'; আর নজরুলের বিদ্রোহী কবিতার—'...আমি সেই দিন হব শান্ত / যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন-রোল, আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না, / অত্যাচারীর খড়গ-কুপাণ ভীম রণভূমে রণিবে না।'

এই অঙ্গীকারে অতীত সংগ্রামী ঐতিহ্যকে নতুন উচ্চতায়, নতুন ইতিহাস গড়বে—এই আহ্বান রেখে আমি সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের ষষ্ঠ কেন্দ্রীয় সম্মেলন উদ্বোধন ঘোষণা করছি।

কমরেড খালেকুজ্জামানের উদ্বোধন ঘোষণার পর একটি সুসজ্জিত র‍্যালি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ করে শাহবাগ, কাঁটাবন ঘুরে কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে গিয়ে শেষ হয়। বিকেলে সেখানে আলোচনাসভা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং নতুন কমিটিকে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়।

উল্লেখ্য, গত ২-৫ আগস্ট ২০তম কাউন্সিলের মাধ্যমে ২১তম কমিটি নির্বাচিত হয়। ১৬ সদস্যবিশিষ্ট কেন্দ্রীয় কমিটিকে পরিচয় করিয়ে দেন সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি মুক্তা বাউ। নবনির্বাচিত কমিটি—

সভাপতি : রিনা মুরমু; সহসভাপতি : অনিক কুমার দাস; সাধারণ সম্পাদক : হারুন অর রশিদ; সাংগঠনিক সম্পাদক : মিজানুর রহমান; দপ্তর সম্পাদক: ইনজামামুল হক; অর্থ সম্পাদক : অদিতি ইসলাম; প্রচার ও প্রকাশনাবিষয়ক সম্পাদক : গোলাম মাওলা; স্কলবিষয়ক সম্পাদক : শারমিন সুলতানা; আন্তর্জাতিকবিষয়ক সম্পাদক : সোহাগী সামিয়া।

সদস্য : বিশ্বজিৎ নন্দী; মিরাজ উদ্দিন; সুজন আহমেদ; রাজিব সূত্রধর; তানজিল হোসেন মুনিম, সাইফুল ইসলাম ও সুপ্রকাশ রায়।

সামাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের ষষ্ঠ কেন্দ্রীয় সম্মেলনের বিকেলের আলোচনা সভায় বক্তাদের বক্তব্য আগামী সংখ্যায় প্রকাশ করা হবে। (সম্পাদক)

Student uprising in South-Asia for education & democratic rights-শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত



সামাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের উদ্যোগে ৮ অক্টোবর জাতীয় প্রেসক্লাবে তোফাজ্জল হোসেন মানিক

মিয়া হলে 'Student uprising in South-Asia for education & democratic rights' শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়।

ব্যাটারিচালিত রিকশা বন্ধ নয়, চাই নিরাপদ চলাচলের অধিকার জননিরাপত্তা, যানজট নিরসন ও শ্রমিকের জীবন-জীবিকা রক্ষায় প্রয়োজন সমন্বিত নীতিমালা

রিকশা, ব্যাটারিচালিত রিকশা-
ভ্যান ও ইজিবাইক সংগ্রাম
পরিষদের উদ্যোগে প্রধানমন্ত্রী
বরাবর স্মারকলিপি প্রদান

সড়কে ব্যাটারিচালিত রিকশা, ইজিবাইক ও সমজাতীয় যানবাহনের চলাচল নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে সরকার ও পরিবহনসংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এসব যানবাহনের নির্মাণগত ত্রুটি, সড়ক দুর্ঘটনা, যানজট, অবৈধ বিদ্যুৎ ব্যবহার ও ট্রাফিক শৃঙ্খলার অবনতির কথা তুলে ধরে এগুলোর চলাচল নিয়ন্ত্রণ বা বন্ধের পক্ষে যুক্তি দিচ্ছে। শুধু তাই নয়, রিকশা, ব্যাটারিচালিত রিকশা-ভ্যান ও ইজিবাইক সংগ্রাম পরিষদের নেতৃবৃন্দকে গ্রেপ্তার, মামলা, কারাবরণ, পুলিশি হয়রানি, চাঁদাবাজি এবং রিকশা জন্দ ও ভাঙচুরের মতো ঘটনার মুখোমুখি হতে হচ্ছে। সংগঠনের নেতৃবৃন্দ বলেন, এসবের প্রতিবাদে আমরা দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন-সংগ্রাম চালিয়ে আসছি। এরই ধারাবাহিকতায় গত ১০ সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রী বরাবর স্মারকলিপি প্রদান এবং ঢাকা, বরিশাল, চট্টগ্রাম, সিলেট, খুলনা, দিনাজপুরসহ সারাদেশে সমাবেশ ও বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করা হয়। কর্মসূচি জানানো দাবি, ব্যাটারিচালিত যানবাহনের নিরাপদ ও বৈধ চলাচল নিশ্চিত করতে অবিলম্বে সমন্বিত নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে। নেতৃবৃন্দ আরও বলেন, এসব সমস্যার সমাধান যানবাহন বন্ধ করে নয়; বরং কারিগরি ত্রুটি দূর করা, নিবন্ধন, চালকের লাইসেন্স ও প্রশিক্ষণ এবং সুনির্দিষ্ট চলাচল বিধি প্রণয়নের মাধ্যমে সম্ভব।

শ্রমিকের জীবন-জীবিকা ও গণপরিবহণে রিকশার ভূমিকা

রিকশা বাংলাদেশের নগর ও গ্রামীণ জীবনের বহুল ব্যবহৃত ও পরিচিত বাহন। শারীরিক শ্রমের মাধ্যমে রিকশাচালকেরা যাত্রী ও মালামাল পরিবহন করে জীবিকা নির্বাহ করে আসছে। অমানবিক শারীরিক শ্রম কমানো, পরিবেশবান্ধব, যাত্রী পরিবহনে স্বাচ্ছন্দ্য আনা এবং চলাচলের খরচ সাশ্রয়ের উদ্দেশ্যে দেশীয় উদ্যোগে প্যাডেলচালিত রিকশায় ব্যাটারি ও বৈদ্যুতিক মোটর সংযোজন শুরু হয়। বর্তমানে ব্যাটারিচালিত রিকশা ও ইজিবাইক শহরের অলিগলি, আবাসিক এলাকা ও গ্রামীণ জনপদে যাত্রী পরিবহনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে আসছে। স্বল্প দূরত্বে সহজে যাতায়াতের সুবিধার কারণে স্বল্প আয়ের মানুষের কাছে এসব যানবাহনের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে।

নেতৃবৃন্দ বলেন, সারাদেশে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রায় ৬০ লাখ চালক ও সংশ্লিষ্ট পেশাজীবী এই খাতের ওপর নির্ভরশীল। তাঁদের পরিবারের সদস্যসহ প্রায় তিন কোটি মানুষের জীবন-জীবিকা এর সঙ্গে যুক্ত। যানবাহন তৈরি, মেরামত, খুচরা যন্ত্রাংশ ও ব্যাটারি উৎপাদন-বিপণনের সঙ্গেও বহু মানুষের কর্মসংস্থান জড়িত। গ্রামীণ অর্থনীতিতেও এই খাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। তাই বিকল্প কর্মসংস্থান ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা ছাড়া এসব যানবাহন বন্ধ



তিমালার দাবিতে বরিশালে ব্যাটারি রিকশা
র স্মারকলিপি পেশ

করা হলে বিপুলসংখ্যক শ্রমজীবী মানুষ ও তাঁদের পরিবার অর্থনৈতিক চরম সংকটে পড়বেন। যা স্বাধীন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে কোনোভাবেই কাম্য নয়। শ্রমিকের জীবন-জীবিকার এই বাস্তবতা উপেক্ষা করে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ কেউই মেনে নেবে না।

দুর্ঘটনা রোধে প্রয়োজন আধুনিকায়ন ও প্রশিক্ষণ

নেতৃবৃন্দ বলেন, ব্যাটারিচালিত রিকশার কাঠামোগত ত্রুটি, দুর্বল ব্রেক, অনিয়ন্ত্রিত গতি এবং চালকদের ট্রাফিক আইন সম্পর্কে অজ্ঞতা দুর্ঘটনার ঝুঁকি বাড়ায়—এসব সমস্যা আমরা অস্বীকার করি না। তবে সমাধান যানবাহন বন্ধ করা নয়, বরং নিরাপত্তার মান উন্নয়ন, কারিগরি ত্রুটি সংশোধন এবং আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ানো। সমস্যা সমাধানে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) বা দক্ষ প্রকৌশলীদের সহায়তায় ব্রেক, গতি নিয়ন্ত্রণ, কাঠামো ও অন্যান্য নিরাপত্তাব্যবস্থার অভিন্ন কারিগরি মান নির্ধারণের দাবি আমরা জানিয়ে আসছি। পাশাপাশি চালকদের ট্রাফিক আইন ও নিরাপদ চালনা সম্পর্কে প্রশিক্ষণ প্রদান, লাইসেন্স প্রদান এবং যানবাহনের ফিটনেস নিশ্চিত করতে হবে। সড়ক দুর্ঘটনার কারণগুলো ইতিমধ্যে চিহ্নিত হয়ে আছে। মোটরসাইকেল, বাস-ট্রাক, ব্যক্তিগত গাড়ি, সড়কের নকশার ত্রুটি, অপব্যবহার ও ট্রাফিক ব্যবস্থাপনার দুর্বলতাসহ এসব কারণ বিবেচনায় নিয়ে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা বাস্তবতার দাবি। কোনো একটি শ্রেণির যানবাহনকে এককভাবে দায়ী করা অযৌক্তিক, যার দ্বারা সমস্যার সমাধানও সম্ভব নয়।

যানজটের সমাধান নিষেধাজ্ঞা নয়, সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা

ব্যাটারিচালিত রিকশার অনিয়ন্ত্রিত চলাচল, যত্রতত্র পার্কিং ও প্রধান সড়কে প্রবেশ যানজটে কিছু ভূমিকা রাখতে পারে, কিন্তু শুধুমাত্র এই বাহনকে দায়ী করলে ব্যক্তিগত গাড়ির আধিক্য, অযৌক্তিক ব্যবহার, পর্যাপ্ত গণপরিবহণের অভাব,

দুর্বল ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা ও যত্রতত্র পার্কিংয়ের সংকটের মতো সমস্যাগুলো আড়ালে থেকে যায়। তাই সড়কের ধরন ও যানবাহনের গতি বিবেচনায় নিয়ে ধীরগতির যানবাহনের জন্য পৃথক লেন বা সার্ভিস রোড নির্মাণ করতে হবে। নির্দিষ্ট চলাচল পথ, পার্কিং ও যাত্রী ওঠানো-নামানোর স্থান নির্ধারণের মাধ্যমে সড়কে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা সম্ভব। এক্ষেত্রে চালক, যাত্রী ও পথচারী-সবার নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যাবে।

বিদ্যুৎ ব্যবহারে চাই শৃঙ্খলাপূর্ণ ব্যবস্থা

ব্যাটারি চার্জিংয়ের ক্ষেত্রে অবৈধ বিদ্যুৎ সংযোগ ও অনিরাপদ ব্যবস্থার অভিযোগ তুলে সব চালককে দায়ী করা যুক্তিসংগত নয়। চালকরা গ্যারেজ বা চার্জিং স্টেশনে নির্ধারিত অর্থ দিয়ে যানবাহন চার্জ করেন। তাই অনিয়মের দায় নির্দিষ্টভাবে নির্ধারণ না করে ঢালাও কথা বললে তা গ্রহণযোগ্য হয় না। সংগ্রাম কমিটির পক্ষ থেকে সরকারকে চার্জিং স্টেশন স্থাপন, বৈধ বিদ্যুৎ সংযোগ ও মিটার নিশ্চিত করা এবং স্বচ্ছ মাশুল নির্ধারণের নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে। ব্যবহৃত ব্যাটারির পরিবেশগত প্রভাব মোকাবিলায় নিরাপদ সংগ্রহ ও পুনর্ব্যবহারের আধুনিক ব্যবস্থাও গড়ে তুলতে হবে। পরিবেশবান্ধব লিথিয়াম ব্যাটারি প্রতিস্থাপন করা ও তার জন্য সরকারি ভর্তুকি প্রদানের ব্যবস্থা করে এই সমস্যা সমাধান করা সম্ভব।

নিবন্ধন ও লাইসেন্সের দায়িত্বে চাই সমন্বিত কর্তৃপক্ষ

নেতৃবৃন্দ বলেন, ব্যাটারিচালিত যানবাহনের নিবন্ধন, চালকের লাইসেন্স ও প্রশিক্ষণ, রুট পারমিট এবং পৃথক লেন নির্মাণসহ ৭ দফা দাবিতে আমরা গত ১৩ বছর ধরে আন্দোলন করে আসছি। আমাদের আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় ‘ইলেকট্রিক মোটরযান রেজিস্ট্রেশন ও চলাচল সংক্রান্ত নীতিমালা, ২০২৩’ অনুমোদিত হলেও ‘প্রি-হুইলার ও সমজাতীয় মোটরযানের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও

নিয়ন্ত্রণ নীতিমালা, ২০২৪’ এখনো চূড়ান্ত ও কার্যকর হয়নি। গণ অভ্যুত্থানের পর আমরা আশা করেছিলাম, শ্রমিকদের আত্মত্যাগ ও অবদানের স্বীকৃতি দিয়ে অন্তর্বর্তী সরকার এ বিষয়ে কার্যকর পদক্ষেপ নেবে। কিন্তু প্রয়োজনীয় উদ্যোগের পরিবর্তে, স্থানীয় সরকার আইনে সংশোধন এনে বিআরটিএকে বাদ দিয়ে সিটি করপোরেশনগুলোতে ব্যাটারিচালিত যানবাহনের টোকেন বা কার্ড প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আমাদের আশঙ্কা, সুনির্দিষ্ট নীতিমালা ও জবাবদিহি ছাড়া এ ব্যবস্থা ব্যবসায়িক সিভিকিটের বিকাশ এবং সড়কে বিশৃঙ্খলা বাড়াবে। গত ৭ সেপ্টেম্বর ২০২৬ জাতীয় সংসদে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বক্তব্যে ব্যাটারিচালিত যানবাহনের জন্য নতুন নীতিমালা ও বিধিমালা দ্রুত কার্যকর করার কথা জানানো হয়েছে। কিন্তু বিআরটিএকে বাদ দিয়ে স্থানীয় সরকারকে নিবন্ধন, লাইসেন্স ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব দেওয়ার বিষয়টি আমাদের উদ্ভিগ্ন করেছে। আমরা মনে করি, যথাযথ প্রস্তুতি ছাড়া স্থানীয় সরকার নিবন্ধন ও তদারকিতে ভূমিকা রাখতে পারবে না; যানবাহনের ফিটনেস যাচাই, কারিগরি মান নির্ধারণ এবং লাইসেন্সিংয়ের ক্ষেত্রে বিআরটিএর বিদ্যমান দক্ষতাকে কাজে লাগাতে হবে। এ জন্য সড়ক পরিবহন মন্ত্রণালয়, বিআরটিএ, স্থানীয় সরকার, ট্রাফিক পুলিশ ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর সমন্বয়ে কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ গঠনের প্রস্তাব করছি। নীতিমালা প্রণয়নের আগে চালক, মালিক, উৎপাদক, শ্রমিক সংগঠন, প্রকৌশলী, পরিবহন বিশেষজ্ঞ ও যাত্রী প্রতিনিধিদের মতামত গ্রহণ করতে হবে। কোনো বিশেষ ব্যবসায়িক গোষ্ঠীর স্বার্থে শ্রমিক ও দেশীয় অটোমোবাইল খাতকে জিম্মি হতে দেওয়া যাবে না।

নিষেধাজ্ঞা নয়, চাই অধিকার ও দায়িত্বের সমন্বয়

ব্যাটারিচালিত রিকশা লাখ লাখ মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করেছে। বয়স্ক ব্যক্তি, শারীরিকভাবে সীমিত সক্ষমতাসম্পন্ন মানুষ এবং বিকল্প কর্মসংস্থান থেকে বঞ্চিত অনেক শ্রমজীবীও এই পেশার মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করেন। তাই পুনর্বাসন ও বিকল্প কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা ছাড়া নিষেধাজ্ঞা আরোপ করলে বেকারত্ব ও অর্থনৈতিক সংকট বাড়বে। সংগ্রাম কমিটির দাবি, ব্যাটারিচালিত রিকশা ও ইজিবাইক বন্ধ নয়, নিরাপদ ও বৈধ চলাচল নিশ্চিত করতে দ্রুত সমন্বিত নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে হবে। ব্যাটারি রিকশা নিবন্ধন, লাইসেন্স প্রদান, প্রশিক্ষণ, ফিটনেস পরীক্ষা, রুট পারমিট, কারিগরি মান উন্নয়ন ও বৈধ চার্জিং ব্যবস্থা চালু করতে হবে। একই সঙ্গে চাঁদাবাজি, জন্দ-ভাঙচুর ও হয়রানি বন্ধে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে। ব্যাটারিচালিত রিকশার সমস্যার স্থায়ী সমাধান নিষেধাজ্ঞা ও বন্ধ নয়, সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনায়। শ্রমিকের কর্মসংস্থান রক্ষা এবং জনগণের নিরাপদ চলাচল নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব। আমরা চাই, সংশ্লিষ্ট সবার অংশগ্রহণে কার্যকর নীতিমালা প্রণয়ন করে ব্যাটারিচালিত রিকশা ও ইজিবাইককে নিরাপদ, সাশ্রয়ী ও সুশৃঙ্খল স্থানীয় গণপরিবহণ ব্যবস্থার অংশ হিসেবে গড়ে তোলা হোক।

Student uprising in South-Asia for education & democratic rights-শীর্ষক সেমিনার অনুষ্ঠিত

চতুর্থ পৃষ্ঠার পর

Asia for education & democratic rights'-শীর্ষক এক আন্তর্জাতিক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের

নবনির্বাচিত সভাপতি রিনা মুরমুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সেমিনারে বক্তব্য রাখেন বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড মনীষা চক্রবর্তী, শ্রীলঙ্কার সোশ্যালিস্ট স্টুডেন্ট ইউনিয়ন (SSU)-এর

ন্যাশনাল কমিটির সদস্য ডিলান আরোসা, অল নেপাল ন্যাশনাল ইনডিপেনডেন্ট স্টুডেন্ট ইউনিয়ন রেভোলিউশনারি (ANNISU)-এর আন্তর্জাতিক বিভাগের উপ-প্রধান পবন গুরুং,

সম্মেলন করেন ছাত্র ফ্রন্টের নবনির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক হারুন আর রশীদ। সেমিনার শেষে নেপাল ও শ্রীলঙ্কার আমন্ত্রিত অতিথিদেরকে শুভেচ্ছা স্মারক ক্রেস্ট প্রদান করা হয়।

নারায়ণগঞ্জে বিজ্ঞান উৎসব অনুষ্ঠিত : বিজ্ঞানভিত্তিক ও বৈষম্যহীন শিক্ষাব্যবস্থা চাই শীতলক্ষ্যা ও বুড়িগঙ্গা দূষণমুক্ত কর, দায়ী রাঘব-বোয়ালদের শাস্তি দাও

বিজ্ঞান আন্দোলন মঞ্চ নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখার উদ্যোগে বিশ্ব বিখ্যাত পাঁচ বাঙালি বিজ্ঞানী—জগদীশ চন্দ্র বসু, আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, মেঘনাদ সাহা, জামাল নজরুল ইসলাম স্মরণে ১২ সেপ্টেম্বর '২৬ আলী আহমেদ চুনকা নগর পাঠাগারে বিজ্ঞান উৎসব ও আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলন উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ ডিবেটিং ক্লাবের সাবেক উপদেষ্টা ও সিনিয়র শিক্ষক শামীম জামান। উদ্বোধনের পর একটি বর্ণাঢ্য র‍্যালি শহর প্রদক্ষিণ করে।

প্রধান আলোচকের বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সহকারী সাধারণ সম্পাদক কমরেড রাজেকুজ্জামান রতন। আরও বক্তব্য রাখেন মিছির আলী কলেজের রসায়ন বিভাগের সাবেক অধ্যাপক সঞ্জিত কুমার, নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের ১৫ নং ওয়ার্ডের সাবেক কাউন্সিলার অসিত বরণ বিশ্বাস, নারায়ণগঞ্জ সাংস্কৃতিক জোটের সহসভাপতি ধীমান সাহা জুয়েল, সমাজতান্ত্রিক মহিলা ফোরামের সাধারণ সম্পাদক সুলতানা আক্তার, সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের আন্তর্জাতিকবিষয়ক সম্পাদক রীনা মুর্মু, ছাত্র ফ্রন্ট নারায়ণগঞ্জ জেলার আহ্বায়ক সাইফুল



ইসলাম। সভাপতিত্ব করেন বিজ্ঞান উৎসব '২৬ উদ্বোধন কমিটির আহ্বায়ক প্রভাতি আক্তার।

রাজেকুজ্জামান রতন বলেন, সমাজব্যাপী অন্ধবিশ্বাস, কূপমণ্ডুকা, অজ্ঞতা দূর করে মানুষের মধ্যে বিজ্ঞানমনস্কতা গড়ে তোলার প্রত্যয় নিয়ে বিজ্ঞান আন্দোলন মঞ্চ কাজ করে যাচ্ছে। আমাদের শাসকগোষ্ঠী বিজ্ঞানচর্চা,

বিজ্ঞানমনস্ক গড়ে তোলার ক্ষেত্রে উদাসীন। এটা বুঝতে পারি যখন দেখি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞান গবেষণায় বরাদ্দ নামমাত্র। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিজ্ঞান শিক্ষা সংকুচিত। আজকে বিজ্ঞান উৎসবে ছাত্র-ছাত্রীদের অংশগ্রহণ ও উৎসাহ বলে দিচ্ছে, আমাদের যুবসমাজ যুক্তিবাদ ও বিজ্ঞান নিয়ে কাজ করতে চায়। অন্ধবিশ্বাস ও কূপমণ্ডুকার

বিরুদ্ধে লড়াইয়ের সাথে সাথে ছাত্র যুবসমাজকে বিজ্ঞানভিত্তিক, বৈষম্যহীন শিক্ষাব্যবস্থার দাবিতে আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।

তিনি নারায়ণগঞ্জে শীতলক্ষ্যা ও বুড়িগঙ্গা দূষণ নিয়ে বলেন, নারায়ণগঞ্জে শীতলক্ষ্যা ও বুড়িগঙ্গা দুটি প্রধান নদী চরম দূষণ হয়ে প্রায় নর্দমায় পরিণত হয়েছে। শুষ্ক মৌসুমে মুখে রুমাল চেপে নদী পারাপার হতে হয়। তবু দূষণ বন্ধে সরকারের কার্যকর কোনো পদক্ষেপ নিচ্ছে না। দূষণের জন্য দায়ী বিভিন্ন রাঘব-বোয়াল মিল-কারখানার মালিকদের বিরুদ্ধে সরকারের কোনো কার্যকর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির পদক্ষেপ নেই?

বিদ্যুৎ সংকট নিরসনে অনেক বিকল্প ব্যবস্থা থাকার পরও সরকার সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থে ফুলবাড়িতে উন্মুক্ত পদ্ধতিতে কয়লা উত্তোলনের পরিকল্পনা করছে। ফুলবাড়িবাসী এটা বাতিলের দাবিতে রক্ত দিয়েছে, প্রয়োজনে আবারও রক্ত দেবে।

বিজ্ঞান উৎসব উপলক্ষ্যে পাঁচ বাঙালি বিজ্ঞানীর কর্ম ও সাধনার উপর নারায়ণগঞ্জে ২৫টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের মাঝে প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। অতিথিবৃন্দ বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার ও সার্টিফিকেট বিতরণ করেন।

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ও পরীক্ষার্থীদের সংবর্ধনা এবং চারণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের কমিটি পরিচিতিসভা অনুষ্ঠিত

২৫ আগস্ট '২৬ বিজ্ঞান আন্দোলন মঞ্চ ও চারণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ফরিদপুর জেলা শাখার আয়োজনে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ও পরীক্ষার্থীদের সংবর্ধনা জেলা শিল্পকলা অ্যাকাডেমির অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় দেড় শতাধিক শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি ও বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষক, অভিভাবক ও সাংস্কৃতিক কর্মীদের অংশগ্রহণে এক প্রাণবন্ত অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। বিজ্ঞান আন্দোলন মঞ্চের জেলা আহ্বায়ক সজল বাউঁদের সভাপতিত্বে ও চারণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের সাধারণ সম্পাদক অনুপম নন্দীর পরিচালনায় বক্তব্য রাখেন বিজ্ঞান আন্দোলন মঞ্চের কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা ও বাসদ



কেন্দ্রীয় কমিটির সহকারী সাধারণ সম্পাদক কমরেড রাজেকুজ্জামান রতন, বাসদ জোন-৭ এর আহ্বায়ক মোসাদ্দেদ হোসেন ঢালী, চারণের নবগঠিত কমিটির সহসভাপতি মো. এমদাদুল হক রনি, বিজ্ঞান আন্দোলন মঞ্চের সদস্য কৌশিক অধিকারী, সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের জেলা সংগঠক মিসফতি ইসলাম, চারণের সদস্য সৌরভ বিশ্বাস প্রমুখ। আলোচনাসভা শেষে নবগঠিত চারণের কমিটি পরিচিতি করিয়ে দেন, সংগঠনের উপদেষ্টা ও বাসদ ফরিদপুর অঞ্চল কমিটির আহ্বায়ক মোসাদ্দেদ হোসেন ঢালী এবং সবশেষে চারণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশনা হয়।

সিরাজগঞ্জে বাসদের সমাবেশে হামলা : তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ

হামলাকারী সন্ত্রাসীদের গ্রেপ্তার ও বিচার দাবি

গণতান্ত্রিক যুক্তফ্রন্ট

চলমান বিদ্যুৎ ও সারের সংকট নিরসনের দাবিতে ২৮ আগস্ট '২৬ বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ, সিরাজগঞ্জের পিপুলবাড়িয়ায় আয়োজিত সমাবেশে স্থানীয় বিএনপির সন্ত্রাসীদের হামলার ঘটনায় তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছে গণতান্ত্রিক যুক্তফ্রন্ট। হামলায় বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও সিরাজগঞ্জ জেলা কমিটির আহ্বায়ক নবকুমার কর্মকার, জেলা কমিটির নেতা পলাশ ঘোষ, আজিজ, আবু শামাসহ ১০ জন নেতাকর্মী আহত হয়েছেন।

বিবৃতিতে নেতৃবৃন্দ বলেন, অব্যাহত বিদ্যুৎ সংকট নিরসন এবং সার সরবরাহ নিশ্চিত করার দাবিতে বাসদের ধারাবাহিক কর্মসূচির অংশ হিসেবে আজ সিরাজগঞ্জের পিপুলবাড়িয়া



বাজারে সমাবেশ চলাকালে বিএনপির একদল সন্ত্রাসী হামলা চালায়। তারা নবকুমার কর্মকারের মাথা ও বুকে আঘাত করে এবং বাসদের নেতাকর্মীদের ওপর লাঠিসোঁটা নিয়ে আক্রমণ করে। হামলায় ১০ জন নেতাকর্মী আহত হন। একপর্যায়ে বাজারের লোকজন ঐক্যবদ্ধভাবে এই হামলা থেকে বাসদের নেতাকর্মীদের রক্ষার চেষ্টা করেন। এ সময় তাঁদের মধ্য থেকেও বেশ কয়েকজন আহত হন।

বিবৃতিতে নেতৃবৃন্দ পুলিশের নিক্রিয়তার নিন্দা জানিয়ে হামলাকারীদের গ্রেপ্তার ও শাস্তির দাবি করেন। তাঁরা বলেন, জনগণের সংকট সমাধান না করে আন্দোলনের ওপর হামলার পরিণতি ভালো হবে না। অতীতের সরকারও এই পথে আন্দোলন দমন করতে চেয়েছিল; তার পরিণতি কী হয়েছে, সেখান থেকে শিক্ষা নেওয়ার আহ্বান জানান তাঁরা। একই সঙ্গে জনগণের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, সংকটের সমাধান করতে হলে

আন্দোলনের পথে সরকারকে দাবি মানতে বাধ্য করতে হবে।

বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেন গণতান্ত্রিক যুক্তফ্রন্টের কেন্দ্রীয় সমন্বয়ক ও বাসদের সাধারণ সম্পাদক কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ, সিপিবির সভাপতি কমরেড সাজ্জাদ জহির চন্দন, সাধারণ সম্পাদক কমরেড আবদুল্লাহ ক্বাফী রতন, বাংলাদেশ জাসদের সভাপতি জনাব শরীফ নূরুল আমিয়া, সাধারণ সম্পাদক নাজমুল হক প্রধান, বিপ্লবী কমিউনিস্ট লীগের সাধারণ সম্পাদক কমরেড ইকবাল কবির জাহিদ, গণতান্ত্রিক বিপ্লবী পার্টির সাধারণ সম্পাদক কমরেড মোশররফা মিশু, বাসদ (মার্কসবাদী)-এর সমন্বয়ক কমরেড মাসুদ রানা, বাসদ (মাহবুব)-এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড হারুনার রশীদ ভূঁইয়া, সমাজতান্ত্রিক পার্টির নির্বাহী সভাপতি কমরেড আব্দুল আলী, জাতীয় গণফ্রন্টের ভারপ্রাপ্ত সমন্বয়ক কমরেড রজত হুদা এবং সোনার বাংলা পার্টির সভাপতি সৈয়দ হারুন অর রশীদ।

নারীনির্যাতন প্রতিরোধ দিবস : অন্যায়ের বিরুদ্ধে এক গণজাগরণ

ইয়াসমিন হত্যাকে ঘিরে
বিস্ফোরিত জনক্ষোভ

মহিলা ফোরামের উদ্যোগে নারী
নির্যাতন প্রতিরোধ দিবস পালিত

১৪ বছর বয়সী দিনাজপুর শহরের রামনগর এলাকার দরিদ্র পরিবারের কিশোরী ইয়াসমিন গৃহশ্রমিক হিসেবে কাজ করত ঢাকায়। ১৯৯৫ সালের ২৩ আগস্ট দিনাজপুরে বাড়ি ফিরছিল সে। কিন্তু ভুল গাড়িতে উঠায় দশমাইল মোড়ে ভোরের আলো ফোটার আগেই একটি চায়ের দোকানের সামনে তাকে নামিয়ে চলে যায় বাসটি। সেখানে আসে পুলিশের একটি পিকআপ ভ্যান। বাড়ি পৌঁছে দেওয়ার আশ্বাস দিয়ে ইয়াসমিনকে পিকআপে তুলে নেয়। কিন্তু সাহায্য প্রদানের কথা বলা সেই পুলিশ সদস্যরাই পালাক্রমে তাকে ধর্ষণ এবং পরে হত্যা করে।

পরদিন এই নির্মম হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে দিনাজপুরে জনতার বিক্ষোভ মিছিলে পুলিশ গুলি চালায়। পুলিশের গুলিতে প্রাণ দেন অকুতোভয় সাতজন সংগ্রামী মানুষ। ইয়াসমিনের ধর্ষণ ও হত্যা এবং আন্দোলনকারী সাতজনকে হত্যার বিচারের দাবিতে সোচ্চার হয়ে ওঠে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে দেশের সর্বস্তরের মানুষ। সমাজতান্ত্রিক মহিলা ফোরামসহ বাম ও প্রগতিশীল নারী সংগঠনগুলোও এই আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে।

সরকার ও পুলিশ প্রশাসন বারবার বিষয়টিকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার চেষ্টা করেছে। ইয়াসমিনের নামে কুৎসা রটিয়ে তার পরিবারকে হুমকি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কোনো অপচেষ্টাই মানুষের ক্ষোভ ও আন্দোলনকে দমাতে পারেনি। আন্দোলনের প্রেক্ষিতে ১৯৯৭ সালে ধর্ষণ ও খুনিদের ফাঁসির রায় এং ২০০৪ সালে রায় কার্যকর হয়।

এরপর থেকে প্রতিবছর ২৪ আগস্ট ইয়াসমিন



হত্যা দিবস ‘নারী নির্যাতন প্রতিরোধ দিবস’ হিসেবে পালিত হয়ে আসছে। ইয়াসমিনের ধর্ষণ ও হত্যার বিচারের দাবিতে গড়ে ওঠা আন্দোলন এবং বিচারের রায় মানুষের মনে এক প্রতিবাদী চেতনার জন্ম দেয়। এই আন্দোলন আমাদের সামনে তুলে ধরে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে মানুষের সম্মিলিত প্রতিরোধই পারে ন্যায়বিচারের পথ তৈরি করতে।

কিন্তু তিন দশক পর আজ প্রশ্ন জাগে—নারীর প্রতি সহিংসতা কতটা কমেছে? নারী নির্যাতন, ধর্ষণ-হত্যা, যৌন হয়রানি, পারিবারিক নির্যাতন ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা আমাদের প্রতিনিয়ত বিচলিত করছে। নারী ও শিশুদের নিরাপত্তাহীনতা আজ সমাজের গভীর সংকটের প্রতিফলন। আরও উদ্বেগজনক হলো, অনেক ক্ষেত্রে মানুষের মধ্যে এমন ধারণা তৈরি হচ্ছে যে নির্যাতন ঘটবেই, অপরাধীরা পার পেয়ে যাবে, বিচার হবে না। অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার বদলে নির্যাতনকে যেন অনিবার্য বাস্তবতা হিসেবে মেনে নেওয়ার প্রবণতা তৈরি হচ্ছে। এই মানসিকতা সহিংসতার চেয়েও ভয়াবহ সামাজিক বিপর্যয়ের

ইঙ্গিত দেয়।

নিরাপত্তাহীনতার এই পরিবেশে আরও একটি বিষয় লক্ষ্য করা যায়—দেশের সব নারী নির্যাতনের শিকার হন না, কিন্তু অধিকাংশ নারীই ‘নির্যাতিত হতে পারে’—এই শঙ্কার মধ্যে থাকেন। এই শঙ্কা নারীর জীবনে আরও গভীর বিপর্যয় ডেকে আনে এবং তার বিকাশকে বাধাগ্রস্ত করে।

নারীর প্রতি সহিংসতা কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। এর শিকড় রয়েছে পুরুষতান্ত্রিক সামাজিক ব্যবস্থা, নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক ও অধস্তন দৃষ্টিভঙ্গি এবং বিচারহীনতার রেওয়াজের গভীরে। পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় মুনাফাকেন্দ্রিকতা ও বৈষম্যের সঙ্গে পুরুষতান্ত্রিক আধিপত্য যুক্ত হয়ে নারীকে নানাভাবে শোষণ ও নিপীড়নের শিকার করে। কর্মক্ষেত্রে মজুরবৈষম্য, নারীর গৃহস্থালি শ্রমের অবমূল্যায়ন, বাল্যবিবাহ, যৌতুক, শিক্ষা ও কর্মসংস্থানে অসম সুযোগ—এসবই নারীর অধস্তন অবস্থাকে টিকিয়ে রাখে। এই বৈষম্যমূলক কাঠামো ভেঙে নারীর সমান অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠা ছাড়া সহিংসতামুক্ত

সমাজ গড়ে তোলা সম্ভব নয়।

নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে আইনের সঠিক বাস্তবায়ন ও বিচারব্যবস্থার কার্যকর ভূমিকা অপরিহার্য। কিন্তু শুধু আইন থাকলেই চলবে না; অপরাধের দ্রুত ও নিরপেক্ষ তদন্ত, অপরাধীর শাস্তি নিশ্চিত করা এবং ভুক্তভোগীর নিরাপত্তা ও মর্যাদা রক্ষা করতে হবে। রাজনৈতিক প্রভাব, সামাজিক ক্ষমতা কিংবা অর্থের দাপটে যেন কোনো অপরাধী পার পেয়ে না যায়, তা নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব। একই সঙ্গে নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে পরিবার, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, কর্মক্ষেত্র এবং সমাজের সর্বস্তরে সচেতনতা গড়ে তুলতে হবে।

নারী নির্যাতন সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন কোনো বিষয় নয়। যে সমাজে বৈষম্য প্রকট, সে সমাজে নির্যাতনও একটি স্বাভাবিক বিষয়ে পরিণত হয়। নারী নির্যাতন প্রতিরোধ দিবস আমাদের এই অন্যায়, অন্যায় ‘স্বাভাবিকতা’কে গুঁড়িয়ে দেওয়ার শিক্ষা দেয়।

ইয়াসমিনের মতো অসংখ্য নারী ও শিশু ধর্ষণ বা হত্যার শিকার হলে কেবল ‘সংখ্যা’য় পরিণত হয়। বিচার তো বহুদূরের কথা! ইয়াসমিনের ধর্ষণ ও খুনিরা ছিল পুলিশ সদস্য, অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার সঙ্গে যুক্ত। ইয়াসমিন হত্যার বিচারের দাবিতে প্রাণ দিলেন সাতজন অকুতোভয় বীর। গণজাগরণের মধ্য দিয়ে রচিত হলো বিজয়গাথা।

নারী-পুরুষের ঐক্যবদ্ধ লড়াই এবং সকল অন্যায় ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে গণআন্দোলন গড়ে তোলার ডাক দিয়ে যায় নারী নির্যাতন প্রতিরোধ দিবস। এ দিবস অনেক প্রেরণার, অনেক অঙ্গীকারের। ইয়াসমিনের আত্মত্যাগ এবং তাকে ঘিরে গড়ে ওঠা গণআন্দোলনের ইতিহাস আমাদের শেখায়—অন্যায়ের কাছে নত না হয়ে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তুললেই ন্যায়বিচার ও মর্যাদার সমাজ প্রতিষ্ঠার পথ তৈরি করা সম্ভব।

উল্লেখ্য, ২৪ আগস্ট সমাজতান্ত্রিক মহিলা ফোরামের উদ্যোগে সারা দেশে পালিত হয়েছে নারী নির্যাতন প্রতিরোধ দিবস।

বিডার সামনে বিক্ষোভ এনসিটি ইজারা চুক্তি বাতিলের দাবি



চট্টগ্রাম বন্দরের নিউমুরিং টার্মিনাল ডিপি ওয়ার্ল্ডকে ইজারা দেওয়ার চুক্তি করার প্রতিবাদে ৮ অক্টোবর ইনভেস্ট বাংলাদেশ (বিডার) সামনে অনুষ্ঠিত বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশে পুলিশি হামলার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানায় সাম্রাজ্যবাদ ও যুদ্ধ বিরোধী জোট।

সাম্রাজ্যবাদ ও যুদ্ধ বিরোধী জোটের সমন্বয়ক বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক

বজলুর রশীদ ফিরোজ এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে জোটের নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন।

নেতৃবৃন্দ বলেন, লাভজনক নিউমুরিং টার্মিনাল বিদেশিদের হাতে তুলে দেওয়ার মাধ্যমে বর্তমান সরকার জনগণের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। সবার আগে বাংলাদেশ স্লোগান দিয়ে বাংলাদেশের স্বার্থ বিদেশিদের হাতে তুলে দিচ্ছে। এর পর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ১

এনসিটি ইজারা চুক্তি বাতিলের দাবিতে কর্মসূচিতে পুলিশি হামলার প্রতিবাদ

ডিপি ওয়ার্ল্ডের সঙ্গে সম্পাদিত চট্টগ্রাম বন্দরের এনসিটি ইজারা চুক্তি বাতিলে দাবিতে বিডা ঘেরাওয়ার শান্তিপূর্ণ কর্মসূচিতে পুলিশি হামলার প্রতিবাদে সাম্রাজ্যবাদ ও যুদ্ধবিরোধী জোটের উদ্যোগে ১১ অক্টোবর কেন্দ্র ঘোষিত সারা দেশে বিক্ষোভ কর্মসূচির অংশ হিসেবে বিকেল সাড়ে ৪টায় জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়।

জোটের সমন্বয়ক ও বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক বজলুর রশীদ ফিরোজের

সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন ডা. মুশতাক হোসেন, মাসুদ রানা, বেলাল চৌধুরী, মঞ্জুর মঈন, হারুনার রশীদ ভূঁইয়া, অধ্যাপক আব্দুস সাভার, আমিরুল নুজহাত মনীষা, মোশেরেফা মিশু ও সৈয়দ হারুন অর রশীদ।

সমাবেশ পরিচালনা করেন কমিউনিস্ট লীগের নেতা শামীম ইমাম। সমাবেশ শেষে একটি বিক্ষোভ মিছিল জাতীয় প্রেসক্লাব থেকে শুরু হয়ে বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে পুরানা পল্টন মোড়ে গিয়ে শেষ হয়।



বিনাইদহ জেলা শাখার তৃতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত

সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট

সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট, বিনাইদহ জেলা শাখার তৃতীয় সম্মেলন ১০ সেপ্টেম্বর '২৬ বিনাইদহ জেলা শহিদ মিনারে অনুষ্ঠিত হয়। এ উপলক্ষে একটি র্যালি অনুষ্ঠিত হয়। সর্বজনীন-বিজ্ঞানভিত্তিক, একই পদ্ধতির গণতান্ত্রিক ও সেকুলার শিক্ষা নীতি প্রতিষ্ঠার লড়াই অগ্রসর করার লক্ষ্যে শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণ বন্ধ, শিক্ষার অধিকার নিশ্চিতকরণ এবং বৈষম্যহীন গণতান্ত্রিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার দাবিতে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

সকালে উজির আলী স্কুলের মাঠ প্রাঙ্গণ থেকে র্যালি শুরু হয়ে শহরের গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে বিনাইদহ কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে উদ্বোধনী সমাবেশ ও জেলা কমিটি পরিচিতিসভা অনুষ্ঠিত হয়।

জেলা শাখার আহ্বায়ক ছাত্রনেতা শারমিন সুলতানার সভাপতিত্বে জাতীয় সংগীত এবং জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে সম্মেলনের



উদ্বোধন ঘোষণা করেন প্রধান আলোচক, বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড শফিউর রহমান শফি। সমাবেশে আরও বক্তব্য রাখেন

সমাজতান্ত্রিক মহিলা ফোরাম কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি নারীনেত্রী প্রকৌশলী শম্পা বসু, বাসদ বিনাইদহ জেলা আহ্বায়ক অ্যাডভোকেট

আসাদুল ইসলাম আসাদ, সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের আন্তর্জাতিকবিষয়ক সম্পাদক রিনা মুরমু, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য লাভনী সুলতানা, সরকারি কেশব চন্দ্র কলেজ শাখার সাধারণ সম্পাদক সাইমুন কবির সিফাত, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় শাখার প্রতিনিধি মো. মাহফুজুর রহমান, বিনাইদহ এটিআই কৃষি ইনস্টিটিউট কলেজ শাখার প্রতিনিধি মো. শাহীন খান শুভ, জেলা শাখার সংগঠক তাবিব সুলতান রাফসান প্রমুখ।

সমাবেশে নেতৃবৃন্দ বলেন, শিক্ষা মানুষের মৌলিক অধিকার হলেও রাষ্ট্র সে দায়িত্ব না নিয়ে তা শিক্ষাব্যবসার জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছে। তাই শিক্ষা বাণিজ্যিকীকরণ, লাগামহীন ফি বৃদ্ধি, সেশনজট, আবাসন ও পরিবহন সংকটসহ নানা সমস্যায় শিক্ষার্থীরা জর্জরিত। শিক্ষাকে পণ্য হিসেবে বিবেচনা করে মুনাফার ক্ষেত্র বানানোর প্রবণতা বন্ধ করে রাষ্ট্রকে শিক্ষার দায়িত্ব নিতে হবে। সর্বজনীন, বিজ্ঞানভিত্তিক, সেকুলার ও বৈষম্যহীন শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য ছাত্রসমাজকে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।

প্রীতি গ্রুপের পোশাক কারখানা চত্বরে গ্যাস সিলিন্ডার বিক্ষোভের স্থান পরিদর্শন ও সমাবেশ



২৩ সেপ্টেম্বর গার্মেন্টস শ্রমিক ফ্রন্টের আশুলিয়ার জামগড়া প্রীতি গ্রুপের পোশাক কারখানা চত্বরে গ্যাস সিলিন্ডার বিক্ষোভের স্থান পরিদর্শন ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত



প্রীতি গ্রুপের পোশাক কারখানায় গ্যাস সিলিন্ডার বিক্ষোভে শ্রমিকের মৃত্যুর প্রতিবাদে এবং গার্মেন্টস খাতে মজুরি নির্ধারণের দাবিতে ২৫ সেপ্টেম্বর গার্মেন্টস শ্রমিক ফ্রন্ট নারায়ণগঞ্জ জেলার সমাবেশ ও মিছিল অনুষ্ঠিত

গার্মেন্টস শ্রমিক ফ্রন্টের কেন্দ্রীয় কমিটির নেতৃবৃন্দ ২৩ সেপ্টেম্বর আশুলিয়ার জামগড়ায় প্রীতি গ্রুপের পোশাক কারখানা চত্বরে গ্যাস সিলিন্ডার বিক্ষোভের স্থান পরিদর্শন শেষে সমাবেশ করেন।

পরিদর্শন টিমে অংশগ্রহণকারী নেতৃবৃন্দ হলেন, গার্মেন্টস শ্রমিক ফ্রন্টের কেন্দ্রীয় কমিটির সহসভাপতি খালেদুজ্জামান লিপন, সাধারণ সম্পাদক সেলিম মাহমুদ, গাজীপুর জেলা শাখার সভাপতি আল আমিন শ্রাবণ, নারায়ণগঞ্জ জেলার সহ-সাধারণ সম্পাদক রুহুল আমিন সোহাগ, আশুলিয়া শাখার সভাপতি মাফিজুল ইসলাম, সদস্য আনোয়ার শিকদার, মিজান মিয়া ও খলিলুর রহমান। সমাবেশে বক্তব্য

রাখেন খালেদুজ্জামান লিপন, সেলিম মাহমুদ ও মাফিজুল ইসলাম।

সমাবেশে নেতৃবৃন্দ কর্মক্ষেত্রে শ্রমিকের নিরাপত্তা ও নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার জোর দাবি জানান। নেতৃবৃন্দ বলেন, প্রীতি গ্রুপের পোশাক কারখানায় যথাযথ সেইফটি নীতিমালা মানা হয়েছে কি না, তা তদন্ত করতে হবে। আমরা অতীতে কারখানার মালিকদের উদাসীনতা ও গাফিলতির ফলে শ্রমিকের মৃত্যুর অনেক বেদনাদায়ক ঘটনা দেখেছি। বিক্ষোভের জন্য দায়ী ও দোষীদের গ্রেপ্তার করে আইনের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করতে হবে এবং দুর্ঘটনায় নিহত ৯ জন শ্রমিকসহ হতাহতদের আইএলও কনভেনশন অনুযায়ী

আজীবন আয়ের সমান ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসন এবং আহতদের সুচিকিৎসা নিশ্চিত করতে হবে। একই সঙ্গে কর্মক্ষেত্রে সকল শ্রমিকের জন্য সর্বজনীন অ্যামপ্লুয়মেন্ট ইনজুরি স্কিম বা EIS প্রথা চালু করতে হবে।

সমাবেশ থেকে নেতৃবৃন্দ অবিলম্বে—

১. প্রীতি গ্রুপের গ্যাস সিলিন্ডার বিক্ষোভে নিহত ৯ শ্রমিকের মৃত্যুর জন্য দায়ীদের নিরপেক্ষ তদন্তের মাধ্যমে শাস্তি দিতে হবে।

২. নিহতদের পরিবারকে আজীবন আয়ের সমপরিমাণ ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

৩. আহতদের পূর্ণাঙ্গ সুচিকিৎসা ও পুনর্বাসন নিশ্চিত করতে হবে।

৪. কর্মক্ষেত্রে স্থায়ী উত্তাপ চালু করতে হবে।

৫. গার্মেন্টস খাতের মজুরি বোর্ড গঠন করে পে-স্কেলের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ন্যায্য মজুরি নির্ধারণ করতে হবে।

৬. সেধুগিরি এ্যাপারেলসসহ বিভিন্ন কারখানার ছাঁটাইকৃত শ্রমিকদের সকল আইনগত পাওনা অবিলম্বে পরিশোধ করতে হবে।

৭. শ্রম আইনের ১২৪(ক) ধারার অপব্যবহার করে শ্রমিক ঠকানো বন্ধ করতে হবে।

৮. শ্রমিকের অভিযোগ নিষ্পত্তিতে প্রকৃত পাওনা নির্ধারণ ও শ্রমিকের স্বাধীন সম্মতি নিশ্চিত করতে হবে।

৯. কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা আইন ও বিধিমালা কঠোরভাবে বাস্তবায়ন এবং নিয়মিত পরিদর্শন নিশ্চিত করতে হবে।

কুষ্টিয়ায় চারণের উদ্যোগে বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের প্রয়াণ দিবসের আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের ৫০তম মহাপ্রয়াণ দিবস উপলক্ষে চারণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্র কুষ্টিয়া জেলা শাখার আয়োজনে ২৯ আগস্ট পৌরসভার বিজয় উল্লাস চত্বরে আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। সংগঠনের জেলা সভাপতি জামাল উদ্দিন খানের সভাপতিত্বে ও খন্দকার হেলায়েত উল্লাহর

(নিদু খন্দকার) সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন চারণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের কেন্দ্রীয় কমিটি সভাপতি নিখিল দাস, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সাইফুজ্জামান, সহযোগী অধ্যাপক ফারহা তানজিম তিতিল, সমাজতান্ত্রিক মহিলা ফোরামের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি প্রকৌশলী শম্পা বসু।



জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধি প্রত্যাহারের দাবি

আইএমএফ-এর বেলআউট কর্মসূচি সরকারকে দেউলিয়া করবে

গণতান্ত্রিক যুক্তফ্রন্ট

জ্বালানি তেলের দাম লিটারপ্রতি ২০ টাকা বাড়ানোর সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে এবং অবিলম্বে মূল্যবৃদ্ধি প্রত্যাহারের দাবিতে গণতান্ত্রিক যুক্তফ্রন্টের বিক্ষোভ সমাবেশে জোটের নেতৃবৃন্দ বলেছেন, আইএমএফ নির্দেশিত কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে গিয়ে বহু দেশের অর্থনীতি মুখ থুবড়ে পড়েছে, অনেক দেশে ক্ষুধা জনতার দ্বারা সরকার উৎখাত হয়েছে। অতীত থেকে শিক্ষা না নিলে আইএমএফ-এর সংস্কার সরকারকে জনসমর্থনহীন দেউলিয়া অবস্থায় নিয়ে যাবে।

নেতৃবৃন্দ আরও বলেন, জ্বালানি তেলের দাম বৃদ্ধি শুধু পাম্পে তেলের দাম বাড়ায় না। এর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব পড়ে গণপরিবহন, পণ্য পরিবহন, কৃষি-শিল্প, বিদ্যুৎ উৎপাদন, নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের বাজার এবং সর্বোপরি সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার ব্যয়ের ওপর। ফলে এই সিদ্ধান্তের বোঝা শেষ পর্যন্ত শ্রমজীবী, নিম্নআয় ও মধ্যবিত্ত মানুষের ওপরই চাপবে।

নেতৃবৃন্দ অবিলম্বে জ্বালানি তেলের বর্ধিত মূল্য প্রত্যাহার, মূল্য নির্ধারণে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করা, জ্বালানি খাতের অনিয়ম-দুর্নীতি ও অপচয় বন্ধ করা এবং জনগণের ওপর মূল্যস্ফীতির চাপ কমাতে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের দাবি জানান।

২১ সেপ্টেম্বর ২৬, জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে



গণতান্ত্রিক যুক্তফ্রন্ট-এর আহ্বানে বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

গণতান্ত্রিক যুক্তফ্রন্টের কেন্দ্রীয় পরিচালনা পরিষদের সমন্বয়ক ও সিপিবিএর সাধারণ সম্পাদক কমরেড আবদুল্লাহ কুফী রতনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ-এর সাধারণ সম্পাদক কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ, বাংলাদেশ জাসদের সাধারণ সম্পাদক কমরেড নাজমুল হক প্রধান, বিপ্লবী কমিউনিস্ট

লীগের সাধারণ সম্পাদক কমরেড ইকবাল কবির জাহিদ, গণতান্ত্রিক বিপ্লবী পার্টির সাধারণ সম্পাদক মোশারফা মিশু, বাসদ (মার্কসবাদী)-র সমন্বয়ক মাসুদ রানা, বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক পার্টির নির্বাহী সভাপতি আব্দুল আলী, বাসদ (মাহবুব)-র কেন্দ্রীয় নেতা মহিউদ্দিন চৌধুরী লিটন, জাতীয় গণফ্রন্টের সমন্বয়ক রজত হুদা, সোনার বাংলা পার্টির সভাপতি সৈয়দ হারুন অর রশীদ প্রমুখ।

সমাবেশে নেতৃবৃন্দ বলেন, সরকার কোনো

ধরনের জনসম্পৃক্ত ও কার্যকর জনস্বার্থ যাচাই ছাড়াই একসঙ্গে ডিজেল-পেট্রোল, অকটেন ও কেরোসিনের দাম লিটারে ২০ টাকা বাড়িয়েছে। নতুন নির্ধারিত দামে ডিজেলের লিটার ১৩৫ টাকা, পেট্রোল ১৬০ টাকা, অকটেন ১৬৫ টাকা এবং কেরোসিন ১৫৫ টাকা হয়েছে।

নেতৃবৃন্দ আরও বলেন, জনগণের আয় ও ক্রয়ক্ষমতা যখন মূল্যস্ফীতির চাপে ইতিমধ্যে সংকুচিত, তখন জ্বালানি তেলের দাম এভাবে বাড়ানো জনজীবনে নতুন করে সংকট তৈরি করবে। বিশেষ করে ডিজেলের দাম বৃদ্ধির কারণে কৃষি ও পরিবহন খাতে ব্যয় বাড়ার পাশাপাশি বাজারে পণ্য পরিবহনের খরচ বৃদ্ধি পাবে।

গণতান্ত্রিক যুক্তফ্রন্টের নেতারা বলেন, সরকার অজুহাত হিসেবে আন্তর্জাতিক বাজার ও পরিবহন ব্যয় বৃদ্ধির কথা বললেও জনগণের ওপর মূল্যবৃদ্ধির বোঝা চাপিয়ে অর্থনৈতিক সংকট মোকাবিলায় পথ গ্রহণযোগ্য নয়। রাষ্ট্রের নীতি নির্ধারণে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা, শ্রমজীবী মানুষের আয় এবং দেশের উৎপাদনব্যবস্থার স্বার্থকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিতে হবে।

সমাবেশ থেকে বলা হয়, জনগণের স্বার্থবিরোধী যেকোনো সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক আন্দোলন অব্যাহত থাকবে। জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধি প্রত্যাহার না করা হলে বৃহত্তর গণ আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানান তারা।

শিক্ষার বেসরকারিকরণ-বাণিজ্যিকীকরণ ও সাম্প্রদায়িকীকরণ প্রতিহত করুন

শিক্ষা দিবসে ছাত্র ফ্রন্টের সমাবেশ ও মিছিল অনুষ্ঠিত

১৭ সেপ্টেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজু ভাস্কর্যের পাদদেশে শিক্ষা দিবস স্মরণে সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের ছাত্র সমাবেশ ও মিছিল অনুষ্ঠিত হয়।

সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি মুক্তা বাউড়ের সভাপতিত্বে সমাবেশে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সাংগঠনিক সম্পাদক সুহাইল আহমেদ শুভ, দপ্তর সম্পাদক অনিক কুমার দাস, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক হারুন অর রশীদ, আন্তর্জাতিক সম্পাদক রিনা মুরমু এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার আহ্বায়ক অদিতি ইসলাম। সভা পরিচালনা করেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক রায়হান উদ্দিন।

সমাবেশে নেতৃবৃন্দ বলেন, ১৭ সেপ্টেম্বর মহান শিক্ষা দিবস। এই দিন শুধু ইতিহাস স্মরণ করার দিন নয়, এই দিন আমাদের মনে করিয়ে দেয়—আমাদের বাংলাদেশ ভূখণ্ডের ছাত্ররা শিক্ষার দাবিতে জীবন দিয়েছিল, রাজপথে রক্ত ঝরিয়ে, জেল-জলুম, নিপীড়ন-নির্যাতন সহ্য করে শিক্ষা অধিকার হিসাবে প্রতিষ্ঠা করেছিল। শিক্ষা কোনো দয়া বা অনুগ্রহ নয়, শিক্ষা মানুষের অধিকার। এই অধিকার দুনিয়াব্যাপী সর্বজনীনভাবে স্বীকৃত। এর জন্য মানুষকে অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছিল। আর সেই অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য এ দেশের ছাত্রসমাজ বারবার রাজপথে রক্ত দিয়েছে, জীবন দিয়েছে, সংগ্রাম করেছে।

১৯৬২ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর তৎকালীন পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর গণবিরোধী শিক্ষা



কমিশনের রিপোর্টের বিরুদ্ধে ছাত্রসমাজ যে আন্দোলন গড়ে তুলেছিল, তা ছিল বৈষম্য ও শোষণের বিরুদ্ধে একটি ঐতিহাসিক গণ আন্দোলন। শিক্ষাকে সংকুচিত করা, সাধারণ মানুষের সন্তানদের উচ্চশিক্ষা থেকে দূরে রাখা এবং শিক্ষাকে ব্যয়বহুল করার যে পরিকল্পনা তৎকালীন স্বৈরশাসক আইয়ুব খান গ্রহণ করেছিলেন, তার বিরুদ্ধে ছাত্ররা রাজপথে নেমেছিল। সেই আন্দোলনে মোস্তফা, বাবুল, ওয়াজি উল্লাহসহ অনেকে শহিদ হন। দেশ স্বাধীন হয়েছে, সরকার বদলেছে, শিক্ষাব্যবস্থার কাঠামো বদলেছে, কিন্তু শিক্ষাকে ঘিরে যে বৈষম্য তা কি দূর হয়েছে? হয়নি। বরং বৈষম্যের নতুন নতুন পথ তৈরি করে তা বেড়েই চলেছে।

আজও একটি পরিবারের সন্তানের জন্য ভালো শিক্ষা পাওয়ার সুযোগ অনেকাংশে

নির্ভর করে তার পরিবারের আর্থিক সামর্থ্যের ওপর। একদিকে রয়েছে ব্যয়বহুল বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, কোচিং-নির্ভর শিক্ষা, নানা ধরনের ফি এবং শিক্ষাকে পণ্যে পরিণত করার নানা প্রবণতা; অন্যদিকে সাধারণ মানুষের সন্তানদের জন্য পর্যাপ্ত সরকারি প্রতিষ্ঠান, শিক্ষক-শ্রেণিকক্ষ, আবাসন ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধার সংকট।

নেতৃবৃন্দ আরও বলেন, আজ শিক্ষার বেসরকারিকরণ, বাণিজ্যিকীকরণ ও সাম্প্রদায়িকীকরণ শিক্ষাব্যবস্থার ওপর বড়ো হুমকি তৈরি করেছে। শিক্ষাকে যখন বাজারের পণ্যে পরিণত করা হয়, তখন তাকে পণ্য ক্রয়ের নিয়ম অনুসারেই ক্রয় করতে হয়। এখন যার টাকা আছে, সে ভালো শিক্ষা পায়, আর যার টাকা নেই, তার সামনে সুযোগ সংকুচিত।

একই সঙ্গে শিক্ষাব্যবস্থায় সাম্প্রদায়িকতা

ও পশ্চাৎপদ চিন্তার বিস্তার একটি গণতান্ত্রিক, বিজ্ঞানমনস্ক ও মানবিক সমাজ গঠনের পথে বাধা সৃষ্টি করে। আমরা এমন শিক্ষা চাই না, যা মানুষকে বিভক্ত করবে। আমরা চাই এমন শিক্ষা, যা মানুষকে যুক্তিবাদী, বিজ্ঞানমনস্ক, মানবিক ও অসাম্প্রদায়িক করে গড়ে তুলবে।

একজন শিক্ষার্থী বছরের পর বছর পড়াশোনা শেষ করে যখন কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করতে যায়, তখন তাকে বেকারত্ব, অনিশ্চয়তা ও প্রতিযোগিতার মুখোমুখি হতে হয়। শিক্ষা যদি মানুষের জীবন ও সমাজের প্রয়োজনের সঙ্গে যুক্ত না থাকে, তাহলে সেই শিক্ষাব্যবস্থার উদ্দেশ্য নিয়েও প্রশ্ন ওঠে। বর্তমান বিএনপি সরকারের ১১-২০তম থ্রেডের চাকরিতে নিয়োগের ক্ষেত্রে লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় ৫০-৫০ নম্বর বন্টনের অযৌক্তিক সিদ্ধান্ত মানবজাত্যকে ক্রম-ব্রলট।

নেতৃবৃন্দ বলেন, আমরা চাই এমন শিক্ষা, যা শুধু চাকরির পরীক্ষার প্রস্তুতি দেবে না; মানুষের সৃজনশীলতার বিকাশ ঘটাবে, উৎপাদন ও গবেষণার সঙ্গে যুক্ত করবে এবং সমাজের বাস্তব প্রয়োজনের সঙ্গে শিক্ষাকে সম্পর্কিত করবে।

নেতৃবৃন্দ আরও বলেন, শিক্ষা দিবসের শিক্ষা হলো—অধিকার কেউ হাতে তুলে দেয় না, আদায় করে নিতে হয়। সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট তার প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে সেই লড়াই জারি রেখেছে। শুধু শিক্ষার অধিকার নয়, দেশের শ্রমজীবী-মেহনতি মানুষের ভাতের অধিকার, চিকিৎসার অধিকার, কাজের অধিকার, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে তাদের সাথে যুক্ত থেকে সাধ্যের সর্বোচ্চ শক্তি দিয়ে সংগ্রাম এগিয়ে নিবে।

চা-শ্রমিকদের দৈনিক মজুরি ৫০০ টাকা নির্ধারণের দাবি

চা-শ্রমিক ফেডারেশনের মতবিনিময় সভায় নেতৃবৃন্দ

এঅঞ্চলে চা বাগান প্রতিষ্ঠার প্রায় ২০০ বছরের ইতিহাসে চা-শ্রমিকদের মজুরি কখনোই মানবিক পর্যায়ে নির্ধারিত হয়নি। তাদের দীর্ঘ ইতিহাস শুধু বঞ্চনা ও শোষণের। বাংলাদেশের বিভিন্ন খাতের শ্রমিকদের তুলনায় চা-শ্রমিকদের মজুরি সবচেয়ে কম। আশেপাশের দেশের চা-শ্রমিকদের তুলনায় তা এত কম যে তা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। চা-শ্রমিকদের নেই ন্যূনতম চিকিৎসা সুবিধা। বাগানে কোনো এমবিবিএস ডাক্তার নেই। নেই শিক্ষা ও নিরাপদ বিশুদ্ধ খাবার পানির ব্যবস্থা। তারা পান করে উন্মুক্ত কুয়া, পাহাড় থেকে নেমে আসা পানির ধারা, ছড়া ও নালার পানি। পয়ঃনিষ্কাশনের সঠিক ব্যবস্থা না থাকায় বৃষ্টির পানির সঙ্গে ময়লা-অবর্জনা মিশে এসব পানির উৎস দূষিত হয়।

এমন প্রেক্ষাপটে চা-শ্রমিকদের দৈনিক নগদ মজুরি ৫০০ টাকা নির্ধারণ, পৃথক মজুরি বোর্ড গঠন এবং চলমান আন্দোলনকে এগিয়ে নেওয়ার লক্ষ্যে বাংলাদেশ চা-শ্রমিক ফেডারেশনের উদ্যোগে ৪ সেপ্টেম্বর মৌলভীবাজার পৌরসভা মিলনায়তনে মতবিনিময় সভা ও শহরে মিছিল



অনুষ্ঠিত হয়।

মতবিনিময় সভায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় সভাপতি বিপ্লব মাদ্রাজ পাশী ও সভা সঞ্চালনা করেন কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক দীপংকর ঘোষ।

মতবিনিময় সভায় প্রধান আলোচক হিসেবে বক্তব্য রাখেন সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্ট কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি কমরেড রাজেকুজ্জামান রতন,। এছাড়া বক্তব্য রাখেন চা-শ্রমিক ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক কৃষ্ণ দাস অলমিক, বাংলাদেশ চা-শ্রমিক ইউনিয়ন সংস্কার কমিটির সদস্যসচিব জনক লাল দেশওয়ারা, চা-

শ্রমিক ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহসভাপতি কাজল রায়, সাংগঠনিক সম্পাদক কিরণ গুরু বৈদ্যসহ বিভিন্ন চা বাগানের পঞ্চায়েত কমিটির নেতৃবৃন্দ।

সভায় নেতৃবৃন্দ বলেন, দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতির এসময়ে চা-শ্রমিকরা খেয়ে না খেয়ে, আধপেটা থেকে হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে বাগানের উৎপাদন বৃদ্ধি করছেন। মালিকরা বিপুল মুনাফা করলেও শ্রমিকদের মজুরি দিচ্ছেন মাত্র ১৮৭ টাকা। এই মজুরি দিয়ে পরিবার-পরিজন নিয়ে তাদের মানবের জীবনযাপন করতে হচ্ছে।

নেতৃবৃন্দ আরও বলেন, ২০২২ সালে চা-শ্রমিকরা দৈনিক ৩০০ টাকা মজুরি বৃদ্ধির

দাবিতে আন্দোলন করলেও তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শ্রমিকদের সঙ্গে প্রতারণা করে মালিকদের সঙ্গে বৈঠক করে ৫০ টাকা বৃদ্ধি করে ১৭০ টাকা মজুরি ঘোষণা করেন। ২০২৩ সালের ১০ আগস্ট ৫ শতাংশ ইনক্রিমেন্ট যুক্ত করে অগণতান্ত্রিক গেজেট প্রকাশ করা হয়। সেই গেজেটের মেয়াদ ৯ আগস্ট ২০২৬ শেষ হওয়ার পরদিন মালিকদের সংগঠন বাংলাদেশীয় চা সংসদ ৫ শতাংশ ইনক্রিমেন্ট যুক্ত করে ১৯৬ টাকা মজুরি ঘোষণা করে, যা অযৌক্তিক ও চরম অগণতান্ত্রিক।

সভা থেকে চা-শ্রমিকদের দৈনিক নগদ মজুরি ৫০০ টাকা নির্ধারণ, পৃথক মজুরি বোর্ড গঠন, শ্রমিকস্বার্থবিরোধী ২০২৩ সালের গেজেট বাতিল, চা-শ্রমিক ইউনিয়ন নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা এবং ভূমির অধিকার নিশ্চিত করার দাবি জানানো হয়। নেতৃবৃন্দ বলেন, চা বাগানগুলোতে মালিকদের যে সিডিকেট গড়ে উঠেছে, তার সাথে যুক্ত হয়েছে কায়মি স্বার্থবাদী নেতৃত্বগোষ্ঠী-এই বৃহচ্চক্রকে শ্রমিকদের আন্দোলনের শক্তিতে ভাঙতে হবে।

নেতৃবৃন্দ মজুরি বৃদ্ধি ও চা-শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে চা বাগানগুলোতে আন্দোলনরত সবাইকে নিয়ে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

গণতান্ত্রিক সাংস্কৃতিক ঐক্যের জাতীয় কনভেনশন অনুষ্ঠিত

১১ পৃষ্ঠার পর

দ্রোহযাত্রা।

নেতৃবৃন্দ বলেন, ফ্যাসিস্ট সরকারের পতন হলেও সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য অক্ষুণ্ণ আছে। দেশে আইনের শাসনের পরিবর্তে মাজার, ভাস্কর্য ভাঙা, মব-সন্ত্রাস, কবিগান, বাউলগান, যাত্রাপালা, চলচ্চিত্র প্রদর্শনী ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে বাধা দেওয়া হচ্ছে। ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী ও নারীদের হেনস্তা করা হচ্ছে। অন্তর্বর্তী সরকারের সময় থেকে ধর্মীয় উগ্রবাদীদের যেভাবে প্রশ্রয় দেওয়া হয়েছে, তা অব্যাহত রয়েছে। তারা স্বাধীন মতপ্রকাশ, মুক্তচিন্তা ও সংস্কৃতির ওপর সুপরিচালিতভাবে আক্রমণ করছে। এই পরিস্থিতিতে গণমানুষের পক্ষে সৃজনশীলতার চর্চা ও সাংস্কৃতিক সংগ্রাম অব্যাহত রাখার জন্য ব্যাপক ঐক্যের প্রয়োজন। সেই লক্ষ্যেই এই কনভেনশন আয়োজন করা হয়েছে।

নূরুল কবির বলেন, সমাজের ইতিবাচক পরিবর্তনের জন্য সারা দেশে সাংস্কৃতিক জাগরণ

সৃষ্টি করতে হবে। সমাজ ব্যবস্থাকে উন্নত করার জন্য মানুষের চেতনাকে বিকশিত হতে সহযোগিতা করাই হলো শিল্পের মূল উদ্দেশ্য। সাংস্কৃতিক আন্দোলনের প্রবাহ রাজনৈতিক সংগ্রাম অভীষ্ট লক্ষ্যের অভিমুখে নিয়ে যেতে হবে। এ প্রক্রিয়ায় ইতিহাসকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে আনতে হবে। এটা করা যায়নি বলেই চব্বিশের গণ অভ্যুত্থানের কাক্ষিত ফল পাওয়া যায়নি। একই কারণে নব্বই ও উনসত্তরের অভ্যুত্থানেরও কাক্ষিত ফল লাভ করা যায়নি। তিনি বলেন, যত দিন প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক ভিত্তিভূমির ওপর রাজনৈতিক সংগ্রাম না দাঁড়াবে, তত দিন বিপ্লব সফল হবে না। তিনি সাংস্কৃতিক কর্মীদের এই কার্যক্রমকে আরও ব্যাপকভাবে সারা দেশে সম্প্রসারিত করার আহ্বান জানান।

অধ্যাপক আনু মুহাম্মদ বলেন, প্রগতিশীল লেখক, শিল্পী, সাংস্কৃতিক কর্মীদের এই কনভেনশন একটি নতুন আশার সঞ্চর করেছে। সাংস্কৃতিক লড়াই সব লড়াইয়ের ভিত্তি। বৈষম্যবাদী-উগ্রধর্মীয় চিন্তা, সাম্প্রদায়িক চিন্তা

এসবের নিজস্ব শক্তি আছে। সমাজের ভেতর থেকেই এসব গোষ্ঠীর সৃষ্টি হয়েছে। কাজেই তাদের প্রতিহত করতে হলে প্রগতির পক্ষের প্রবল শক্তির প্রয়োজন। সেই শক্তি আসবে ঐক্যের মাধ্যমে। এ কারণে এই কনভেনশন ঐতিহাসিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ। তিনি কনভেনশনের উদ্যোক্তাদের আরও বেশি সংখ্যায় নারী, ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণের সুযোগ তৈরির পরামর্শ দেন।

কারামুক্ত বাউলশিল্পী আবুল সরকার মহারাজ বলেন, কারাগার থেকে মুক্তি পেলেও তিনি নিজেকে মুক্ত বলে অনুভব করতে পারছেন না। তিনি তাঁর নিজের মতো করে গান করতে পারেন না। বাড়ি থেকে বের হতে পারেন না। স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে পারেন না। সব সময় ভয়ের মধ্যে রয়েছেন। এই বন্দিভূ, এই ভয় থেকে মুক্ত পরিবেশে ফিরে আসতে চান তিনি। সমাজে সেই পরিবেশ সৃষ্টির আহ্বান জানান। যাঁরা তাঁর মুক্তির জন্য আন্দোলন করেছেন, তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন তিনি।

জাতীয় কবিতা পরিষদের সভাপতি কবি মোহন রায়হান বলেন, প্রগতিশীল লেখক, শিল্পী ও সাংস্কৃতিক কর্মীদের নিয়ে দানবীয় আকার পাওয়া ধর্মীয় উগ্রবাদীদের রুখে দিতে হবে। সাহসের সঙ্গে সাংস্কৃতিক কর্মীদের সংগ্রাম করতে হবে।

এই পর্বে আরও বক্তব্য দেন উনসত্তরের অভ্যুত্থানের নেত্রী দীপা দত্ত, লেখক রণজিৎ চট্টোপাধ্যায়, যাত্রাশিল্প উন্নয়ন পরিষদের সাধারণ সম্পাদক এস আলম, প্রগতি লেখক সংঘের কোষাধ্যক্ষ দীনবন্ধু দাস, সমাজ অনুশীলন কেন্দ্রের আহ্বায়ক বিমল কান্তি দাস, চারণ সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের সাধারণ সম্পাদক জাকির হোসেন, সমাজচিন্তা ফোরামের আহ্বায়ক কামাল হোসেন প্রমুখ। সঞ্চালনা করেন বিবর্তন সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের সাধারণ সম্পাদক ও কনভেনশন প্রস্তুতি পরিষদের সদস্যসচিব মফিজুর রহমান।

প্রথম অধিবেশনের পরে ছিল দুপুরের খাবারের জন্য বিরতি। বিকেলে ছিল সাংগঠনিক অধিবেশন, শেষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

বিভার সামনে বিক্ষোভ : এনসিটি ইজারা চুক্তি বাতিলের দাবি

সপ্তম পৃষ্ঠার পর

ডিপি ওয়ার্ল্ডের সাথে আমেরিকার নৌবাহিনীর চুক্তি থাকায় আমাদের দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও জাতীয় নিরাপত্তার জন্যও এটি মারাত্মক হুমকি। পরিচালনার নামে বিদেশি কোম্পানির হাতে কর্তৃত্ব তুলে দিতেই সরকার চুক্তি করছে। দেশ বিক্রির এই চুক্তির বিরুদ্ধে দেশবাসীকে রাজপথে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ার আহ্বান জানান নেতৃবৃন্দ।

নেতৃবৃন্দ বন্দর ইজারা চুক্তির এই দিনকে কালো দিবস হিসেবে উল্লেখ করেন, ইনভেস্ট বাংলাদেশ ভবনকে ‘কাশিম বাজার কুটি’ চক্রান্তের মঞ্চ হিসেবে উল্লেখ করেন এবং বন্দর ইজারা চুক্তির হোতা কুখ্যাত আশিক চৌধুরীসহ চুক্তির হোতাদেরকে ‘৭১-এর যুদ্ধাপরাধীদের মতোই সার্বভৌমত্ব বিরোধী হিসেবে চিহ্নিত

করে বলেন, জনগণ এসব দেশদ্রোহিদের বিচার একদিন বাংলার মাটিতে করবেই।

নেতৃবৃন্দ বলেন, শান্তিপূর্ণ সমাবেশের সময় সম্পূর্ণ বিনা উসকানিতে পুলিশ লাঠিচার্জ করে নেতাকর্মীদের আহত করে। এতে জোটের সমন্বয়ক বাসদের সাধারণ সম্পাদক বজলুর রশীদ ফিরোজ, সিপিবি'র কেন্দ্রীয় সভাপতি সাজ্জাদ জহির চন্দন, বাসদনেতা ডা. মণীষা চক্রবর্তী, বাসদ (মার্কসবাদী)র সীমা দত্ত, সিপিবি'র নেতা মিলন, ছাত্র ফ্রন্টের দীপাসহ ৩০ জন নেতাকর্মী আহত হয়। নেতৃবৃন্দ সমাবেশে পুলিশ হামলার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানান। বন্দর ইজারা চুক্তি থেকে সরে না আসলে বন্দর শ্রমিক, বন্দর ব্যবহারকারী ও সকল দেশপ্রেমিক রাজনৈতিক দল ও জনগণের সাথে আলোচনা করে প্রয়োজনে হরতালসহ কঠোর কর্মসূচি ঘোষণার হুঁশিয়ারি প্রদান করেন নেতৃবৃন্দ।

নিউমিরিং টার্মিনাল DP WORLD এর কাছে ইজারা দেওয়ার প্রতিবাদে ১২ অক্টোবর চট্টগ্রামে বন্দর ভবনের সামনে চুক্তি বাতিলের দাবিতে বন্দর রক্ষা সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে গণঅনশন কর্মসূচিতে বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ, সাম্রাজ্যবাদ ও যুদ্ধ বিরোধী জোটের পক্ষ থেকে সংহতি প্রকাশ ও কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ।



গণপতি চক্রবর্তী পরিবারের নৃশংস হত্যাকাণ্ডসহ সকল হত্যা-ধর্ষণের দ্রুত বিচার ও বেহাল আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের দাবি

সারাদেশে গণতান্ত্রিক যুক্তফ্রন্টের প্রতিবাদ

আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে সরকার ব্যর্থ

রংপুর জেলা স্কুলের প্রাক্তন শিক্ষক গণপতি চক্রবর্তী পরিবারের ৪ সদস্যের নৃশংস হত্যাকাণ্ডসহ সকল হত্যা-ধর্ষণের দ্রুত বিচার ও বেহাল আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের দাবিতে অনুষ্ঠিত বিক্ষোভ সমাবেশে গণতান্ত্রিক যুক্তফ্রন্ট নেতৃবৃন্দ বলেন, বিগত ৬ মাসের শাসনকালে ক্ষমতাসীন সরকার আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। উপরন্তু, রংপুরের হত্যাকাণ্ডে সূচ্য তদন্তের পরিবর্তে দ্রুত ঘটনা ধামাচাপা দিতে গিয়ে মনগড়া গল্প ফেঁদে



৫ সেপ্টেম্বর জাতীয় প্রেসক্লাবের সমানে গণতান্ত্রিক যুক্তফ্রন্টের বিক্ষোভ সমাবেশ

প্রমাণ করেছে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি উন্নয়নে সরকারের সদিচ্ছার অভাব রয়েছে।

গণতান্ত্রিক যুক্তফ্রন্টের কেন্দ্রীয় সমন্বয়ক ও

বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির (সিপিবি) সাধারণ সম্পাদক আবদুল্লাহ কাফী রতনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন

বাংলাদেশ জাসদের স্থায়ী কমিটির সদস্য ডা. মুশতাক হোসেন, বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য জুলফিকার আলী, গণতান্ত্রিক বিপ্লবী পার্টির সাধারণ সম্পাদক মোশেরাফা মিশু, বাসদ (মাহবুব) সাধারণ সম্পাদক হারুনার রশীদ ভূঁইয়া, বাসদ (মার্কসবাদী)র কেন্দ্রীয় নির্বাহী ফোরামের সদস্য সীমা দত্ত, বিপ্লবী কমিউনিস্ট লীগের সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য নজরুল ইসলাম, সমাজতান্ত্রিক পার্টির নির্বাহী সভাপতি আব্দুল আলী, সোনার বাংলা পার্টির সভাপতি সৈয়দ হারুন অর রশীদ প্রমুখ। সমাবেশ পরিচালনা করেন মঈনুদ্দিন চৌধুরী লিটন।

সমাবেশে গণতান্ত্রিক যুক্তফ্রন্টের নেতৃবৃন্দ বলেন, দেশে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির ক্রমাবনতি, বিচারহীনতা, হত্যা-ধর্ষণ, চাঁদাবাজি, ছিনতাই, সন্ত্রাস ও নানা ধরনের সামাজিক এরপর পৃষ্ঠা ১৩ কলাম ১



৭ সেপ্টেম্বর গণতান্ত্রিক যুক্তফ্রন্টের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের উপস্থিতিতে রংপুরে সমাবেশ



১৫ সেপ্টেম্বর গণতান্ত্রিক যুক্তফ্রন্ট রংপুর জেলা শাখার উদ্যোগে অবস্থান কর্মসূচি

গণতান্ত্রিক সাংস্কৃতিক ঐক্যের উদ্যোগে

প্রগতিশীল লেখক, শিল্পী ও সাংস্কৃতিক কর্মীদের জাতীয় কনভেনশন অনুষ্ঠিত

‘কণ্ঠে মোদের কুণ্ডলবিহীন নিত্যকালের ডাক’ স্লোগানে অনুষ্ঠিত হয়েছে প্রগতিশীল চিন্তার লেখক, শিল্পী ও সাংস্কৃতিক কর্মীদের জাতীয় কনভেনশন। ঢাকায় শিল্পকলা একাডেমির জাতীয় নাট্যশালায় প্রধান মিলনায়তনের লবিতে ১১ সেপ্টেম্বর ‘২৬ সমাজের প্রগতিশীল পরিবর্তনের জন্য দেশজুড়ে সামাজিক-সাংস্কৃতিক আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্য নিয়ে সকাল থেকে সারা দিন নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে এই কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়।

কনভেনশনের আনুষ্ঠানিকতার সূচনা হয় সকালে জাতীয় নাট্যশালায় প্রধান মিলনায়তনের লবিতে। সমবেত কণ্ঠে ‘এসো মুক্ত করো’, ‘জনতার সংগ্রাম চলবেই’ ও ‘দুর্গমগিরি’ এই তিন সংগীতের পর জাতীয় সংগীত পরিবেশন করেন শিল্পীরা।

উদ্বোধন ঘোষণা করেন বিশিষ্ট লেখক ও সাংবাদিক নূরুল কবির। তিনি বলেন, সাংস্কৃতিক আন্দোলন হলো রাজনৈতিক আন্দোলনের ভিত্তিভূমি। বর্তমান সময়ে প্রগতিশীল রাজনৈতিক ধারা এগিয়ে নিতে এই কনভেনশন অত্যন্ত প্রয়োজনীয় উদ্যোগ।

উদ্বোধনের পর লেখক, শিল্পী, সাংস্কৃতিক



কর্মীদের একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা নাট্যশালায় প্রাঙ্গণ প্রদক্ষিণ করে।

সকাল থেকেই দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে লেখক, শিল্পী, সাংস্কৃতিক কর্মীরা কনভেনশন কেন্দ্রে আসতে থাকেন। দেশের ৪৫টি জেলা থেকে বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিনিধিরা ছাড়াও অনেকে ব্যক্তিগতভাবে কনভেনশনে অংশ নিয়েছেন। এ ছাড়া বিভিন্ন প্রগতিশীল রাজনৈতিক

দল ও শ্রমজীবী-পেশাজীবী সংগঠনের নেতারাও এসেছিলেন।

উদ্বোধনী আনুষ্ঠানিকতার শেষে মিলনায়তনে শুরু হয় উদ্বোধনী অধিবেশন। একক কণ্ঠে হোমজ বিশ্বাসের বিখ্যাত গণসংগীত ‘শঙ্খচিল’ পরিবেশন করেন শিল্পী মাইশা সুলতানা। আবৃত্তি করেন দীপক সুমন। খাগড়াছড়ির ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক সংগঠন ‘প্রতিরোধ সাংস্কৃ

তিক স্কোয়াড’ জুম্ম জনগোষ্ঠীর জীবন ও সংস্কৃতি অবলম্বনে বিশেষ নৃত্য পরিবেশন করে। এরপর শুরু হয় আলোচনা পর্ব।

এই আয়োজনের সভাপতিত্ব করেন গণতান্ত্রিক সাংস্কৃতিক ঐক্যের আহ্বায়ক জামসেদ আনোয়ার তপন। শুরুতেই এই কনভেনশনের পরিপ্রেক্ষিতে ও লক্ষ্য তুলে ধরা হয় সংগঠনের পক্ষ থেকে। এতে বলা হয়, ফ্যাসিবাদী শাসক শেখ হাসিনার প্রবর্তিত নিবর্তনমূলক সাইবার নিরাপত্তা আইনের বিরুদ্ধে ২০২৩ সালের ৬ মে রাজধানীতে এক প্রতিবাদ কর্মসূচির মধ্য দিয়ে গণতান্ত্রিক সাংস্কৃতিক ঐক্যের সূত্রপাত। তখন ৩১টি সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠন যৌথভাবে এই কর্মসূচির পালন করেছিল। পরে সরকারের ফ্যাসিবাদী কর্মকাণ্ডের প্রতিবাদে আন্দোলন অব্যাহত ছিল। এরপর ২০২৪ সালে ২০ জুলাই কারফিউ জারি করা হলে সাংস্কৃতিক কর্মীদের এই মোর্চা প্রথম কারফিউ ভেঙে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে প্রতিবাদী সমাবেশ ও গানের মিছিল করে। এরই ধারাবাহিকতায় ৩০ জুলাই গানে গানে প্রতিবাদী শিল্পীরা রাজপথ দখল করেন। জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে থেকে ২ আগস্ট করেছিলেন এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ১

নেপালের ভূমিধস কী শিক্ষা দিয়ে গেল?

জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যবহার ও কার্বন নিঃসরণ রোধে বৈশ্বিক উস্মায়ন বন্ধ করতে হবে

অকস্মাৎ পাহাড়ি ঢলে ভেঙে চূরমার হয়ে গেল নেপালের পাহাড়ি অঞ্চল। ২৬ আগস্ট স্থানীয় সময় সকাল প্রায় ৮টা ৩০ মিনিটে নেপাল-চীন সীমান্তের কাছে লাংটাং লিরুং হিমবাহের উঁচু অংশ থেকে বরফ গলা পানি আর লক্ষ লক্ষ টন পাথর আছড়ে পড়ে। একে বলে হড়পা বান বা ফ্ল্যাশ ফ্লাড। এর ফলে নেপালের উত্তর সীমান্তে তিব্বত-সংলগ্ন রাসুয়া জেলায় হিমবাহ, এর তলদেশের শিলা ও কাদার মিশ্রণটি লেন্দে খোলা ও ভোতে কোশী নদী উপত্যকায় হাজার হাজার ফুট নিচে ধসে পড়ে। পাহাড় থেকে নেমে আসা কাদার শ্রোত জমে লেন্দে খোলা নদীতে প্রথমে একটি সাময়িক বাঁধ তৈরি করে। প্রবল শ্রোতের চাপে বাঁধটি ভেঙে যাওয়ার পর প্রায় ৬৫০ ফুট উঁচু জল-কাদা, ধ্বংসাবশেষ ও পাথরের বিশাল ঢল রাসুয়া ও নুয়াকোট জেলার দিকে ভাটিতে ধাবিত হয়ে নদীর পাশের সড়কটিকে ভেঙে চূর্ণবিচূর্ণ করে দেয়। নেমে আসার পথে শুধু সড়ক নয়, এটি সেতু, ঘরবাড়ি এবং ভারত ও বাংলাদেশকে বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য নেপালে নির্মীয়মাণ জলবিদ্যুৎ প্রকল্প ধ্বংস করে এবং নেপাল ও তিব্বতের মধ্যে গ্যারোং বন্দর সীমান্ত ক্রসিংটি নিশ্চিহ্ন করে দেয়। প্রকৃতির ধ্বংসলীলার ভিডিও যারা দেখেছেন, তাঁরা শিউরে উঠেছেন এর ভয়ংকর শক্তি দেখে।

এটা এতটাই আকস্মিক ও গতিশীল ছিল যে, নদী উপত্যকায় বসবাসরত মানুষদের কাছে সাত লক্ষ পঞ্চাশ হাজার বার্তা পাঠিয়েও সতর্ক করতে পারেনি। মানুষ সতর্কবার্তা কাজে লাগানোর সময় পায়নি। ফলে সবশেষ খবর অনুযায়ী নেপাল ও তিব্বত মিলিয়ে দেশি-বিদেশি ১৪৫৭ জনের বেশি মানুষ মারা গেছেন আর প্রায় ৫ হাজার মানুষ নিখোঁজ হয়ে গেছেন। এদের মধ্যে বিভিন্ন দেশ থেকে আগত অসংখ্য পর্যটকও আছেন। এখনও নিখোঁজ আছেন নেপালের ১২টি জলবিদ্যুৎকেন্দ্রের অন্তত ৯০০ শ্রমিক এবং সেনাবাহিনী ও নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরাও। শ্রোতের তীব্রতা এত বেশি ছিল যে নদীর ১৫০ মাইল ভাটিতেও মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। খেঁতলে যাওয়া, পচে যাওয়া মৃতদেহ শনাক্ত করা কঠিন হয়ে পড়েছে। হড়পা বানে ৮০টি সেতু, ৪০ কিলোমিটার গুরুত্বপূর্ণ সড়কপথ ক্ষতিগ্রস্ত বা নিশ্চিহ্ন হয়েছে। ভোতে কোশীর হড়পা বানে রাসুয়া, নুয়াকোট, ধাদিং, গোরখা, চিতওয়ানসহ ৮টি জেলা বিধ্বস্ত হয়েছে। নদীর দুই ধারের প্লাবনভূমিতে গড়ে ওঠা ঘরবাড়ি, বাজার, রিসোর্ট-হোটেলসহ সবকিছু ভেসে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। শুধু নেপাল নয়, সীমান্তে চীনের দিকেও শত শত মানুষ হতাহত হয়েছে। নেপালের এই ভয়াবহ চিত্র সকলেই দেখেছেন। প্রশ্ন উঠেছে, এই

বিপর্যয় কী অনিবার্য ছিল?

এই হিমবাহ ধসের প্রাথমিক বর্ণনায় ভূমিকম্পকে এর জন্য দায়ী করা হয়েছিল। কিন্তু মার্কিন ভূতাত্ত্বিক জরিপ বলছে, এটি ভূমিকম্প ছিল না। ভূকম্পন সংকেতগুলো শত শত টন পাথর ও বরফের ধসকে ৫.২ মাত্রার ভূকম্পনজনিত ঘটনা হিসেবে রেকর্ড করেছে, কিন্তু ভূমিকম্পের বৈশিষ্ট্য-টেকটোনিক স্থানচ্যুতি বা ফল্ট সরে যাওয়ার ঘটনা ঘটেনি। আর বন্যার সঠিক কারণ এখনো স্পষ্ট নয়, তবে ভারী বৃষ্টিপাতের কারণেই বন্যা হয়েছে এমনটাও বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন না, কারণ ভারী বৃষ্টিপাত কোনো নতুন ঘটনা নয়। এখন পর্যন্ত যা জানা গেছে তা হলো : এই ধসে ১,৮০০ ফুট চওড়া একটি হিমবাহের অংশ এবং তার নিচের ভিভিশিলা ভেঙে প্রায় ১০,০০০ ফুট নিচে পড়ে। ফলে প্রবল পতনের বেগে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছে সামনে যা পড়েছে সবকিছু।

লাংটাং লিরুং হলো হিমালয় পর্বতমালার নেপাল অংশের ল্যাংটাং হিমাল উপশ্রেণির সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ। এই শৃঙ্গ থেকে বরফের বিশাল স্তর কেন ভেঙে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল, তার সঠিক কারণ এখনো নির্ধারিত হয়নি। তবে বিজ্ঞানীরা দীর্ঘদিন ধরেই বায়ুদূষণ ও বৈশ্বিক উষ্ণায়নের কারণে হিমবাহ ধস ঘটতে পারে এবং ভাটিতে প্রাণঘাতী বন্যার ঝুঁকি নিয়ে সতর্ক করে আসছেন। জীবাশ্ম জ্বালানির অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহারের কারণে যে সুস্ব্ব ছাই ছড়িয়ে পড়ছে, সে বিষয়ে কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলোকে দায়ী করে আসছেন পরিবেশবিদরা। দেখা যাচ্ছে, হিমালয়ের হিমবাহগুলোর সাদা পৃষ্ঠে জীবাশ্ম জ্বালানি দূষণের কালো ছাই যে জমছে, তার ফলে বরফের শুভ্রতা ক্রমশ মলিন হয়ে পড়ছে। হিমবাহের এই পৃষ্ঠগুলো সাদা থাকলে সূর্য থেকে আসা শক্তির ৯০% পর্যন্ত প্রতিফলিত করে—এটি উচ্চ অ্যালবেডো। (অ্যালবেডো হলো কোনো তলে আপতিত আলোর প্রতিফলিত হওয়ার অনুপাত।) আর যদি কালো কার্বনের আন্তরণে ঢাকা থাকে, তাহলে তা তাপ ও আলো শোষণ করে এবং মাত্র ৪০% তাপ প্রতিফলিত করতে পারে। ফলে কালো আন্তরণ একটি গাঢ় পৃষ্ঠ তৈরি করে, যা প্রচুর তাপ শোষণ করে। এর ফলে সৃষ্ট উষ্ণায়ন হিমবাহকে ছিদ্রযুক্ত করে তোলে, এই ছিদ্রে পানি প্রবেশ করে এবং ঠান্ডায় পানি আবার বরফে পরিণত হয়। বরফের আয়তন বেশি বলে তা ফাটল তৈরি করে এবং আরও গলিত পানিকে তাদের ভেতরে প্রবেশ করতে দেয় এবং হিমবাহ, ধস ও বন্যার ঝুঁকি বাড়ায়। হিমবাহ বাইরে থেকে দেখতে স্থির মনে হলেও সঞ্চরণশীল। সব হিমবাহের গতি আছে এবং সেগুলো ভিন্ন ভিন্ন গতিতে স্থান পরিবর্তন করে থাকে। উপগ্রহ চিত্র বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, হিমালয়ের অংশের হিমবাহগুলো অন্তত ২০২৬ সালের শুরু থেকে ধীরে চলছে। বরফ গলা পানি হিমবাহগুলোকে আরও সহজে চলতে

সাহায্য করে এবং বরফের উপরিভাগে ও নিচে হ্রদ তৈরি করে। পানির চাপে ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যখন এটি খাড়া পর্বতঢালে ঘটে, তখন হিমবাহ ও পাথরের বিশাল খণ্ড ভেঙে পড়তে পারে, যা বিপুল শক্তিতে নেমে আসে নিচে। যার ফলে প্রাণঘাতী ভূমিধস ও হিম ধস হয়। বিজ্ঞানীদের ধারণা, সম্ভবত লাংটাং লিরুংয়ে এই ঘটনাই ঘটেছে।

জীবাশ্ম জ্বালানি পোড়ানোর মাধ্যমে বৈশ্বিক উষ্ণায়নে সবচেয়ে বেশি ভূমিকা রাখে এমন দুটি উপাদান হলো : কালো কার্বন এবং মিথেন গ্যাস। কালো কার্বন সূক্ষ্ম কণাজনিত বায়ুদূষণের একটি উপাদান এবং জীবাশ্ম জ্বালানি, কাঠ ও অন্যান্য বর্জ্য পোড়ানোর ফলে এটা উৎপন্ন হয়। কালো কার্বন সূর্যালোক ও তাপ শোষণ করে তাপ ধরে রাখে। কালো কার্বন, বরফ ও তুষারের মতো উচ্চ প্রতিফলনক্ষম পৃষ্ঠে পড়ে যখন একটি অস্বচ্ছ স্তর তৈরি করে, তখন তা তাপ ধরে রাখার ক্ষমতা বাড়ায়। বৈশ্বিক উষ্ণায়নের জন্য দায়ী সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলো এর দায় অস্বীকার করতে যুক্তি করে যে, কালো কার্বন বায়ুমণ্ডলে খুব বেশি সময় থাকে না, কিন্তু কতক্ষণ থাকে সেটা বড় কথা নয়, এই কার্বন যে পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর, এই সত্য অস্বীকার করার উপায় নেই। কয়লা, পেট্রোল ও ডিজেলের মতো জীবাশ্ম জ্বালানির অসম্পূর্ণ দহনের ফলে এই কার্বন উৎপন্ন হয়। ফলে ট্রাম্পের মতো যারা জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার কমানোর পরিবর্তে বাড়ানোর চেষ্টা করে, তাঁরা পরিবেশ বিপর্যয়কে অনিবার্য করে তুলছে। তেল কোম্পানির স্বার্থ আর পরিবেশ রক্ষাকে পরস্পরবিরোধী করে তুলেছে তাঁরা। উৎপাদন, আধুনিক জীবনযাত্রা অব্যাহত রাখতে জ্বালানি লাগবেই। কিন্তু প্রকৃতি ও পরিবেশ ধ্বংস করে জ্বালানি, নাকি নবায়নযোগ্য জ্বালানি—এই সিদ্ধান্ত নিতে হবে বিশ্বকে। ট্রাম্প এবং তার সহযোগীরা তেল ব্যবসার স্বার্থে বলছে, জীবাশ্ম জ্বালানি নবায়নযোগ্য শক্তির চেয়ে সস্তা ও অনেক বেশি নির্ভরযোগ্য। তাঁরা জলবায়ু পরিবর্তন ও বৈশ্বিক উষ্ণায়নকে অস্বীকার করতে পারে না, কিন্তু এর দায় এড়িয়ে যেতে বলে, এ হচ্ছে অনেক কারণের জটিল ফল। বিজ্ঞানের এত অগ্রগতি ঘটেছে, মঙ্গল গ্রহে পানির সন্ধান করতে যাচ্ছে, আর আমাদের এই গ্রহকে রক্ষা করার পথ খুঁজে পাচ্ছে না—একি বিশ্বাসযোগ্য? নেপালের কথাই যদি ধরা যায়, তাহলে জাতিসংঘের এক সমীক্ষা থেকে বলা হয়েছিল, উষ্ণায়নের কারণে গ্লেসিয়াল লেক আউটবাস্ট ফ্লাডের (হিমবাহ-হ্রদে জলোচ্ছ্বাসজনিত বন্যা) সম্ভাবনা ১৯৫০ থেকে পাঁচ গুণ বেড়ে গেছে। সমীক্ষার পর বন্যা প্রতিরোধের জন্য হিমালয় বন্যা সুরক্ষা প্রকল্প তৈরি করে (হিমালয় ফ্লাড প্রোটেকশন প্রজেক্ট) ২০১৮ সালে গ্রিন ক্লাইমেট ফান্ডের কাছে আবেদন পেশ করেছিল নেপাল সরকার। এই প্রকল্প অনুমোদন করতে সময় লেগেছে সাত বছরের বেশি। প্রকল্পে ক্রমাগত বৃদ্ধি পাওয়া বন্যার হুমকি থেকে নেপালের মানুষ, বাস্তুতন্ত্র ও পরিকাঠামোকে বাঁচানোর জন্য প্রস্তাব করা হয়েছিল। যদি

সময়মতো তা কার্যকর হতো, তাহলে হয়তো আজ নেপালকে এই হিমালয় হড়পা বানের ক্ষতির মুখে পড়তে হতো না।

নেপালের বিপর্যয় শুধু নেপালের ধ্বংসের কারণ হয়েছে তাই নয়, তা বাংলাদেশসহ গোটা পৃথিবীর জন্য এক সতর্ক সংকেত। বাংলাদেশ ভৌগোলিকভাবে গড়ে উঠেছে হিমালয় পর্বতমালা থেকে নেমে আসা পানি ও পলি দিয়ে। বাংলাদেশ ভূখণ্ডটা গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা—এই তিনটি প্রধান হিমালয় থেকে নেমে আসা নদীর বদ্বীপে অবস্থিত। ফলে উজানে ঘটা যে কোনো বিপর্যয় আন্তঃসীমানার নদীর মাধ্যমে বাংলাদেশে প্রভাব ফেলবে। জলবায়ু উষ্ণায়নের কারণে হিমালয়ের হিমবাহ গলে গেলে পাহাড়ের ঢালে হিমবাহ-হ্রদ বা গ্লেসিয়াল লেক তৈরি হতে থাকবে। অতিরিক্ত পানির চাপে এই হ্রদগুলোর বরফ ও মাটির ভঙ্গুর বাঁধ ভেঙে গেলে মুহূর্তের মধ্যে কোটি কোটি লিটার পানি, পাথর ও কাদা নিচের উপত্যকায় নেমে আসবে। ২০২৩ সালের সিকিমের দক্ষিণ লোনাক হ্রদের পানি বিপুল বেগে নিচে নেমে এসে এরকম ঘটনা ঘটিয়েছিল। এর ফলে ৫ কোটি ঘনমিটার পানি প্রবল বেগে তিস্তা নদী দিয়ে ৩৮৫ কিলোমিটার প্রবাহিত হয়ে বাংলাদেশ পর্যন্ত পৌঁছেছিল। ফলে নেপাল, ভারত এবং চীনেও এ ধরনের ঘটনা ঘটলে তা বাংলাদেশের জন্য হুমকি তৈরি করবে। হিমালয়ের উষ্ণায়ন, হিমবাহ-হ্রদ তৈরি, বাঁধ ভেঙে নদীপথে জলশ্রোতের তীব্রতা, পাহাড় থেকে নেমে আসা পলি জমা, নাব্যতা হ্রাস, বর্ষার বৃষ্টির সঙ্গে মিলিত হয়ে ভয়াবহ বন্যা-বিপদের এই চক্রটি খেয়াল রাখতে হবে।

প্রকৃতি নিয়ম মেনে চলে। মুনাফার স্বার্থে প্রকৃতিকে ধ্বংস করলে প্রকৃতি তার বিরূপতা দেখাবেই। পুঁজিবাদ শ্রম শোষণ তীব্র করেছে তাই নয়, সাময়িক মুনাফা বাড়াতে প্রাকৃতিক সম্পদের উন্মত্ত ব্যবহার করে মানবজাতিকেই বিপন্ন করে তুলছে। বাংলাদেশেও নদীর নাব্যতা ধ্বংস, গতিপথ পরিবর্তন, অপরিকল্পিত বাঁধ, ব্যারেজ নির্মাণ, সেতুর নামে নদীসংহার, নদী দখল, দূষণ ইত্যাদি প্রাণ-প্রকৃতি ধ্বংস ও সাধারণ মানুষের জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলছে। ধনীরা দেশকে লুট করে নিরাপদ আবাস গড়ে তুলছে বিদেশে। আর এর বিষময় ফল ভোগ করবে দেশবাসী। এই অবস্থা কি চলতে দেওয়া উচিত? নেপালের আকস্মিক হড়পা বান দেখালো, এটা আকস্মিক নয়, অনিবার্য ছিল। আমরাও কি তথাকথিত উন্নয়নের নামে এই ধরনের বিপর্যয়ের অপেক্ষা করছি? রামপালসহ নানা কয়লা বিদ্যুৎ প্রকল্প, ফুলবাড়ি উন্মুক্ত কয়লা খনি প্রকল্প, কিংবা নদীর গতি পালটানো ব্যারেজ নিয়ে সোচ্চার হওয়া পরিবেশ রক্ষার স্বার্থেই জরুরি। দেশ বাঁচাতে এবং প্রজন্মের প্রতি দায় পালন করতে প্রতিটি পরিবেশ-ধ্বংসী প্রকল্পের বিরুদ্ধে সকলের রুখে দাঁড়ানো উচিত।

উর্বর কৃষি জমিতে সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্প না করার আহ্বান

শেষ পৃষ্ঠার পর

যে জমিতে মানুষের স্থায়ী ঘরবাড়ি রয়েছে কিংবা যেসব জমি নিয়ে আইনি বিরোধ বা স্বত্বাধিকারের জটিলতা রয়েছে, সেখানে সোলার পার্ক নির্মাণের অনুমতি দেওয়া হয় না। সরকার কর্তৃক ঘোষিত যেকোনো বিশেষ কৃষি জোন বা সংরক্ষিত কৃষি বনে সৌরবিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ দণ্ডনীয় অপরাধ। উন্নয়নমূলক কাজে ভূমির প্রয়োজন হলে এবং তার জন্য অকৃষি খাস জমি পাওয়া গেলে খাস জমি ব্যবহারকে প্রাধান্য দিতে হবে।

নেতৃবৃন্দ বলেন, কৃষি জমিতে

নিয়মবহির্ভূতভাবে সৌরবিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন কিছুসংখ্যক ব্যবসায়ী ও দলীয় লোকজনকে মুনাফার সুযোগ করে দেবে। বিপরীতে সাধারণ মানুষ চরম দুর্দশায় পড়বে।

নেতৃবৃন্দ আরও বলেন, সৌরবিদ্যুৎ স্থাপনের জন্য সারা দেশে একটা ম্যাপ করতে পারে সরকার। তার বাইরে যাতে কেউ সৌরবিদ্যুৎকেন্দ্র করতে না পারে, সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। বাংলাদেশ ‘প্যারিস চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী দেশ হিসেবে কৃষককে কৃষি জমি থেকে উচ্ছেদ করে দেশের মানুষকে

খাদ্যসংকটে ফেলতে পারে না। এভাবে কৃষিজমিতে বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের অনুমতি দেওয়ার পেছনে দুর্নীতি ছাড়া আর কিছুই থাকতে পারে না। তাঁদের মতে, যে প্রক্রিয়ায় সৌরবিদ্যুৎকেন্দ্র তৈরি হচ্ছে, তা সরকারকে বন্ধ করতে হবে।

নেতৃবৃন্দ বলেন, অতীতে কৃষকরা তাঁদের জমি রক্ষা করতে গিয়ে পুলিশ ও মাস্তানের নির্যাতনের শিকার হয়েছেন এবং মিথ্যা মামলায় হয়রানি ও কারাভোগ করতে হয়েছে।

সংবাদ সম্মেলনে বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ বলেন, আমরা সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্পের বিরোধী নই।

বরং কীভাবে তা বাড়ানো যায় সে দাবি আমাদের সবার। কিন্তু অবশ্যই সরকারি নীতিমালা অনুযায়ী সৌরবিদ্যুৎকেন্দ্রগুলো স্থাপন করতে হবে। জমির স্বল্পতার কারণে সৌরবিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনের জন্য অনাবাদি বা পতিত সরকারি জমি, বিভিন্ন সরকারি দপ্তর, রেলপথ ও সড়ক বিভাগের অব্যবহৃত খালি জায়গা এবং বিশেষ করে কলকারখানা ও বাসাবাড়ির ছাদ ব্যবহার করার দাবি জানানো হয় সংবাদ সম্মেলন থেকে।

সংবাদ সম্মেলনে কৃষক ও ক্ষেতমজুর সংগ্রাম পরিষদের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

গণপতি চক্রবর্তী পরিবারের নৃশংস হত্যাকাণ্ডসহ সব হত্যা-ধর্মণের দ্রুত বিচার ও আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের দাবি

১১ পৃষ্ঠার পর

অপরাধ সাধারণ মানুষের জীবনকে চরম অনিরাপদ করে তুলেছে। রাষ্ট্রের আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যকর ভূমিকার অভাব এবং অপরাধীদের বিচারের আওতায় আনতে ব্যর্থতার কারণে অপরাধীরা আরও বেপরোয়া হয়ে উঠছে।

নেতৃবৃন্দ আরও বলেন, রংপুরে গণপতি চক্রবর্তী পরিবারের সদস্যদের নৃশংস হত্যাকাণ্ড অত্যন্ত মর্মান্তিক ও উদ্বেগজনক। একটি পরিবারের চার সদস্যকে হত্যার মতো ভয়াবহ ঘটনায় প্রকৃত কারণ ও হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত সকল ব্যক্তিকে চিহ্নিত করে আইনের আওতায় আনতে নানা গড়িমসি করা হয়েছে। তদন্তে শক্তিশালী কোনো পক্ষের প্রভাব, রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ ও অন্য কোনো শক্তি দ্বারা প্রভাবিত

হওয়ার জোরালো অভিযোগ উঠেছে।

সমাবেশে বক্তারা আরও বলেন, জনগণের জানমালের নিরাপত্তা দেওয়া রাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। কিন্তু আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির কারণে সাধারণ মানুষ আজ নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা ও অপরাধ দমন ছাড়া গণতন্ত্র, মানবাধিকার ও নাগরিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব নয়।

নেতৃবৃন্দ বলেন, বিচারহীনতার সংস্কৃতি অব্যাহত থাকলে সমাজে অপরাধপ্রবণতা আরও বাড়বে। মানুষের জীবনে আতঙ্ক বাড়বে, জনজীবন ঝুঁকিতে পড়বে। তাই অপরাধীদের দ্রুত বিচারের পাশাপাশি আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর জবাবদিহি নিশ্চিত করতে হবে এবং জনগণের আস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিতে হবে।

গণতান্ত্রিক যুক্তফ্রন্টের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের রংপুর সফর

৭ সেপ্টেম্বর গণতান্ত্রিক যুক্তফ্রন্টের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দে গণপতি চক্রবর্তী পরিবারের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের স্থান পরিদর্শন করেন এবং পাড়াপ্রতিবেশীদের সাথে ও তার আত্মীয়স্বজনের সাথে কথা বলেন।

গণপতি চক্রবর্তী পরিবারের সদস্যদের নৃশংস হত্যার বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটির তত্ত্বাবধানে প্রকৃত খুনিদের দ্রুত গ্রেপ্তার, সারাদেশে দখলবাজি, চাঁদাবাজি, বাস টার্মিনাল, ফুটপাথ, বাজার, জলমহাল, বালুমহাল, হাটবাজার, কেবল, ইন্টারনেট ব্যবসার নিয়ন্ত্রণে খুন-ধর্মণ, ছিনতাই ও মাদক বন্ধে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণের দাবিতে গণতান্ত্রিক যুক্তফ্রন্ট রংপুর জেলা শাখার উদ্যোগে ৭ সেপ্টেম্বর প্রেসক্লাব চত্বর থেকে বিক্ষোভ মিছিল নগরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ

শেষে কাছারি বাজারে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সংগঠনের রংপুর জেলা সমন্বয়ক, বাসদের জেলা আহ্বায়ক কমরেড আব্দুল কুদ্দুসের সভাপতিত্বে ও সিপিবি রংপুর জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক কাফি সরকারের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য দেন গণতান্ত্রিক যুক্তফ্রন্টের কেন্দ্রীয় সমন্বয়ক সিপিবি কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক আব্দুল্লাহ ক্বাফি রতন, বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ, বাংলাদেশ জাসদের কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক নাজমুল হক প্রধান, বাসদ (মার্কসবাদী) কেন্দ্রীয় নির্বাহী ফোরাম সদস্য সীমা দত্ত, বাংলাদেশের বিপ্লবী কমিউনিস্ট লীগের সাধারণ সম্পাদক ইকবাল কবির জাহিদ, সোনার বাংলা পার্টির সভাপতি সৈয়দ হারুন অর রশীদ, জাতীয় গণফ্রন্টের কেন্দ্রীয় নেতা রজত হুদা, বাসদ (মাহবুব)-এর নেতা শওকত হোসেন আহমেদ প্রমুখ।

ফুলবাড়ী আন্দোলন : জাতীয় সম্পদ, পরিবেশ ও জনজীবন রক্ষার সংগ্রাম

উন্মুক্ত পদ্ধতিতে কয়লা উত্তোলনের কোনো উদ্যোগ জনগণ মেনে নেবে না

দেশের জাতীয় সম্পদের মালিকানা কার, আর কার স্বার্থে ব্যবহৃত হবে-দেশের মানুষের কল্যাণে, নাকি লুটেরা শাসক ও বহুজাতিক কোম্পানির মুনাফার জন্য? দেশের খনিজ সম্পদ, মাটি-পানি, কৃষি ও পরিবেশের ভবিষ্যৎ নির্ধারণের অধিকার কার-জনগণের, নাকি সাম্রাজ্যবাদের কাছে নতজানু শাসকগোষ্ঠী ও বহুজাতিক কোম্পানির? দেশে যখন দুর্ভোগ নেমে আসে, সেটা মোকাবিলা করে কে? পেট্রোবাংলা ও খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরোর সক্ষমতা কেন বাড়ে না? দেশকে সমৃদ্ধ করার জন্য হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে কারা, আর সুফল ভোগ করে কারা? দিনাজপুরের ফুলবাড়ী আন্দোলনে এসব প্রশ্নই জড়িয়ে ছিল। এ আন্দোলন ছিল জাতীয় স্বার্থ বিরোধী অসম চুক্তি, পরিবেশ বিপর্যয় এবং জাতীয় সম্পদের ওপর জনগণের মালিকানা প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম।

২০০৬ সালের ২৬ আগস্ট উন্মুক্ত পদ্ধতিতে কয়লা উত্তোলনের বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে গিয়ে তৎকালীন বিডিআর ও পুলিশের গুলিতে নিহত হন আমিনুল ইসলাম আমিন, মো. সালেকিন ও তরিকুল ইসলাম। আহত হন প্রায় দুই শতাধিক মানুষ। হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে হরতাল-অবরোধসহ আন্দোলন তীব্র হলে তৎকালীন বিএনপি-জামায়াত জোট সরকার ৩০ আগস্ট আন্দোলনকারীদের সঙ্গে ছয় দফা চুক্তি করতে বাধ্য হয়। কিন্তু দুই দশক পরিয়ে গেলেও চুক্তির গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গীকার বাস্তবায়িত হয়নি। বরং কয়লাখনি প্রকল্প নিয়ে নতুন করে বর্তমান সরকারের আলোচনা জনমনে উদ্বেগ সৃষ্টি করেছে।

ফুলবাড়ী আন্দোলনের পটভূমি

১৯৯৪ সালে দিনাজপুরের ফুলবাড়ীতে কয়লার সন্ধান ও সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের জন্য অস্ট্রেলীয় প্রতিষ্ঠান বিএইচপির সঙ্গে সরকারের চুক্তি হয়। প্রতিষ্ঠানটি কয়লার সন্ধান পেলেও অঞ্চলটির ভূতাত্ত্বিক গঠন, কৃষিজমি, বন্যপ্রাণ ভূপ্রকৃতি ও ঘনবসতির কারণে পরিবেশগত ও সামাজিক ক্ষতির আশঙ্কায় খনন শুরু করেনি। ১৯৯৮ সালে তারা তাদের লাইসেন্স লন্ডনভিত্তিক এশিয়া এনার্জি করপোরেশনের কাছে হস্তান্তর করে বাংলাদেশ ত্যাগ করে। বর্তমানে কোম্পানিটি জিসিএম রিসোর্সেস পিএলসি নামে



ফুলবাড়ী দিবস উপলক্ষে ২৬ আগস্ট ২০২৬ তেল-গ্যাস, খনিজ সম্পদ ও বিদ্যুৎ-বন্দের রক্ষা জাতীয় কমিটির উদ্যোগে ঢাকায়ে কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে কমিটির নেতৃবৃন্দের শ্রদ্ধা নিবেদন। একই দিন দিনাজপুরের ফুলবাড়ীতে কমিটির উদ্যোগে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

পরিচিত।

প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, ফুলবাড়ীতে আনুমানিক ৫৭২ মিলিয়ন বা ৫৭ কোটি ২০ লাখ টন উন্নত মানের বিটুমিনাস কয়লার মজুত রয়েছে। এর বাজারমূল্য প্রায় ৮৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বা ১০ লক্ষ ২১ হাজার ৮০৫ কোটি টাকা।

কেন উন্মুক্ত পদ্ধতির বিরোধিতা?

কয়লা উত্তোলনের বিভিন্ন পদ্ধতির মধ্যে উন্মুক্ত পদ্ধতিতে ভূপৃষ্ঠের ওপরের বিপুল পরিমাণ মাটি সরিয়ে কয়লা উত্তোলন করা হয়। ফুলবাড়ীর প্রস্তাবিত খনির কয়লা ভূপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ৫০০ থেকে ৯০০ ফুট গভীরে। খনির আয়তন প্রায় ৬৫ থেকে ৭০ বর্গকিলোমিটার এবং গর্ত তৈরির জন্য প্রায় ২০ বর্গকিলোমিটার এলাকা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। কয়লার স্তরের ওপর ৮০ থেকে ১২০ মিটার পুরু ‘ডুপিটাল’ নামক পানির স্তর রয়েছে। এ বিপুল পানি অপসারণ করেই কয়লা উত্তোলন করতে হবে। এলাকার প্রায় ৮০ শতাংশ উর্বর তিন ফসলি কৃষিজমি।

ফলে উন্মুক্ত পদ্ধতিতে খনন হলে ২ থেকে ৩ লাখ মানুষ ভিটেমাটি ও কর্মসংস্থান হারিয়ে বাস্তুহীন হবেন। তাঁদের বড় অংশই দরিদ্র সাঁওতাল ও অন্যান্য আদিবাসী জনগোষ্ঠীর। এটা ছিল জাতীয় স্বার্থ বিরোধী একটা অসম চুক্তি। কারণ, চুক্তি অনুযায়ী বাংলাদেশ পাবে মাত্র ৬

শতাংশ রয়্যালটি, আর এশিয়া এনার্জি পাবে ৯৪ শতাংশ।

এ পদ্ধতিতে কয়লার স্তরে পৌঁছাতে বিপুল মাটি সরাতে ও পানি অপসারণ করতে হবে। যার ফলে, ধ্বংস হবে কৃষিজমি, বসতবাড়ি ও গাছপালা, ধ্বংস হবে বাস্তুতন্ত্র, ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে পরিবেশের। ভূগর্ভস্থ পানি নিষ্কাশনের ফলে পানির স্তর নেমে যাবে, শুকিয়ে যাবে পুকুর-জলাশয় এবং ক্ষতিগ্রস্ত হবে কৃষি ও জীববৈচিত্র্য। খনির দূষিত পানি নদী-খালে প্রবাহিত হলে পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্যের ওপরও দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব পড়তে বাধ্য। তাই ফুলবাড়ীর মানুষের দাবি ছিল-জীবন-জীবিকা ও পরিবেশ ধ্বংস করে কোনো উন্নয়ন প্রকল্প চাপিয়ে দেওয়া যাবে না।

রক্তের বিনিময়ে অর্জিত ছয় দফা চুক্তি

তেল-গ্যাস-খনিজ সম্পদ ও বিদ্যুৎ-বন্দের রক্ষা জাতীয় কমিটি এবং ফুলবাড়ী রক্ষা কমিটির নেতৃত্বে গড়ে ওঠা আন্দোলনে ফুলবাড়ী, বিরামপুর, পার্বতীপুর ও নবাবগঞ্জের হাজার হাজার মানুষ অংশ নেন। ২০০৬ সালের ২৬ আগস্টের হত্যাকাণ্ডের পর আন্দোলন আরও তীব্র হলে ৩০ আগস্ট সরকার আন্দোলনকারীদের সাথে ছয় দফা চুক্তি করতে বাধ্য হয়।

৩০ আগস্টের চুক্তিতে এশিয়া এনার্জির

সঙ্গে সম্পাদিত চুক্তি বাতিল ও কোম্পানিকে বাংলাদেশ থেকে বহিষ্কার, দেশের কোথাও উন্মুক্ত পদ্ধতিতে কয়লা উত্তোলন না করা এবং সংশ্লিষ্ট জনগণের সম্মতি ছাড়া কয়লা উত্তোলনের সিদ্ধান্ত না নেওয়ার অঙ্গীকার করা হয়। পাশাপাশি নিহতদের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ, আহতদের সহায়তা, ঘটনার তদন্ত, আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে মামলা প্রত্যাহার ও নতুন মামলা না করা এবং শহীদদের স্মরণে স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়।

কিন্তু এসব অঙ্গীকারের অধিকাংশই বাস্তবায়িত হয়নি। চুক্তি বাতিল, এশিয়া এনার্জিকে বহিষ্কার ও উন্মুক্ত পদ্ধতিতে কয়লা উত্তোলন বন্ধের প্রতিশ্রুতি কার্যকর হয়নি। আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে মামলা প্রত্যাহারও সম্পূর্ণ হয়নি; বরং নতুন করে হয়রানির অভিযোগ উঠেছে।

এশিয়া এনার্জির তৎপরতা ও নতুন উদ্বেগ

এশিয়া এনার্জি বর্তমানে জিসিএম রিসোর্সেস নামে ফুলবাড়ী কয়লাখনিকে তাদের ভবিষ্যৎ ব্যবসার গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প হিসেবে তুলে ধরছে। কোম্পানির তথ্য অনুযায়ী, ২০২০ সালে চীনের প্রতিষ্ঠান পাওয়ারচায়নার সঙ্গে প্রকল্প উন্নয়ন নিয়ে সমঝোতা হয়, যার মেয়াদ পরবর্তী সময়ে বাড়ানো হয়েছে। ফলে দীর্ঘদিন পর ফুলবাড়ী কয়লাখনি নিয়ে নতুন করে উদ্বেগ দেখা দিয়েছে।

ফুলবাড়ী আন্দোলন দেখিয়েছে, জনগণের মতামত উপেক্ষা করে জাতীয় সম্পদ লুটপাটের সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেওয়া যায় না। জাতীয় সম্পদ জনগণের সম্পদ; এর ব্যবহার নির্ধারিত হতে হবে জনস্বার্থ, পরিবেশগত নিরাপত্তা ও গণতান্ত্রিক অধিকারকে অগ্রাধিকার দিয়ে।

তেল-গ্যাস, খনিজ সম্পদ, বিদ্যুৎ-বন্দের রক্ষা জাতীয় কমিটির দাবি, ২০০৬ সালের ছয় দফা চুক্তি পূর্ণাঙ্গভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে। এশিয়া এনার্জির সঙ্গে সম্পাদিত চুক্তি বাতিল ও কোম্পানিটিকে বহিষ্কারের অঙ্গীকার কার্যকর করতে হবে। প্রাণ-প্রকৃতি ও পরিবেশ ধ্বংস করে দেশের কোথাও উন্মুক্ত পদ্ধতিতে কয়লা উত্তোলন না করার অঙ্গীকার অক্ষুণ্ণ রাখতে হবে। আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে দায়ের করা হয়রানিমূলক মামলা প্রত্যাহার এবং শহীদদের স্মৃতিস্তম্ভ সংরক্ষণে কার্যকর ব্যবস্থা নিতে হবে।

শহীদ আমিন, সালেকিন ও তরিকুলের আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে ফুলবাড়ীর মানুষ যে অধিকার ও দাবি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তা বাস্তবায়ন করাই হবে তাঁদের প্রতি প্রকৃত শ্রদ্ধা। জাতীয় সম্পদ, কৃষি, পরিবেশ ও জনগণের জীবন-জীবিকা রক্ষার সংগ্রাম তাই আজও প্রাসঙ্গিক।

উৎপাদন ও কর্মসংস্থানের সুরক্ষায় শিল্প-কারখানায় গ্যাস-বিদ্যুৎ সরবরাহে অগ্রাধিকার দাও মজুরি বোর্ড গঠন করে পে-স্কেলের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ গার্মেন্টস শ্রমিকদের মজুরি ঘোষণা করো

মজুরি বোর্ড পুনর্গঠন করে পে-স্কেলের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে মজুরি নির্ধারণ; শ্রম আইনের ১২৪-ক ধারার অপব্যবহার করে শ্রমিকদের আইনগত পাওনা থেকে বঞ্চিত করার চর্চা বন্ধ, সেধুরি অ্যাপারেলসসহ বন্ধ সকল কলকারখানার শ্রমিকদের আইনগত সম্পূর্ণ পাওনা অবিলম্বে পরিশোধ, কলকারখানায় গ্যাস-বিদ্যুতের সরবরাহ অগ্রাধিকারভিত্তিতে নিশ্চিত করা, মালিক সমিতির নিয়ন্ত্রিত ডেটাবেসের মাধ্যমে ব্ল্যাক লিস্টিং বন্ধ করার দাবিতে ১১ সেপ্টেম্বর জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে বিক্ষোভ সমাবেশ ও মিছিল করে গার্মেন্টস শ্রমিক ফ্রন্ট।

গার্মেন্টস শ্রমিক ফ্রন্টের সভাপতি আহসান হাবিব বুলবুলের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক সেলিম মাহমুদের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্টের সভাপতি রাজেকুজ্জামান রতন, গার্মেন্টস শ্রমিক ফ্রন্টের সহসভাপতি খালেদুজ্জামান লিপন, অর্থ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম শরিফ, দপ্তর সম্পাদক হাসনাত কবির, কেন্দ্রীয় সংগঠক মোহাম্মদ সোহেল, আল-আমিন হাওলাদার শ্রাবণ, মোফাজ্জল হোসেন, রুহুল আমিন সোহাগ, সহিদুল ইসলাম, রোকসানা আফরোজ আশা, সীমা আক্তার, তারিকুল ইসলাম সুজন, আজিজুল ইসলাম, মো. শাওন প্রমুখ।

সমাবেশে নেতৃবৃন্দ বলেন, বাংলাদেশের পোশাক শিল্পের সর্বশেষ মজুরি বাস্তবায়ন হয়েছিল ২০২৩ সালের ডিসেম্বর মাসে। শ্রম (সংশোধন) আইন, ২০২৬-এর ১৩৯(৬) ধারা অনুসারে প্রতি ৩ বছর পরপর খাতভিত্তিক মজুরি পুনর্নির্ধারণের বাধ্যবাধকতা রয়েছে এবং ধারা ১৩৯(২) অনুসারে গঠিত মজুরি বোর্ড মজুরি নির্ধারণের জন্য স্বাভাবিকভাবে ৬ মাস সময় নিতে পারে। অর্থাৎ, গার্মেন্টস খাতে নতুন মজুরি চলতি বছরের ডিসেম্বর থেকে বাস্তবায়ন



হতে হবে এবং সেই প্রয়োজনে ইতিমধ্যে মজুরি বোর্ড গঠন করার সময় পার হয়ে গেছে। তাই, অবিলম্বে মজুরি বোর্ড গঠন করতে হবে এবং মজুরি বোর্ড যে সময়েই গঠিত হোক না কেন, তা চলতি বছরের ডিসেম্বর থেকেই কার্যকর করতে হবে।

নেতৃবৃন্দ আরও বলেন, বাংলাদেশের অর্থনীতির অন্যতম প্রধান ভিত্তি হলো- গার্মেন্টস শিল্প; আর গার্মেন্টস শিল্পের প্রাণ হলো গার্মেন্টস শ্রমিক। শ্রমিকদের ট্যাক্সের টাকায় যে সরকারি কর্মচারীদের বেতন হয়, সেই কর্মচারীদের জন্য ঘোষিত পে-স্কেলের সর্বনিম্ন মূল মজুরি ২০ হাজার টাকা ঘোষণা করা হয়েছে। তা ছাড়া, গার্মেন্টস শিল্পে বাংলাদেশের প্রতিদ্বন্দ্বী ভিয়েতনামের গার্মেন্টস শ্রমিকদের সর্বনিম্ন মজুরি ২৪০ ডলারের বেশি (প্রায় ২৯,৫০০ টাকা); অথচ বাংলাদেশের গার্মেন্টস শ্রমিকদের বর্তমান ন্যূনতম মজুরি মাত্র ১০০ ডলারেরও কম। তাই গার্মেন্টস শ্রমিকদের নতুন মজুরি অবশ্যই নতুন

ঘোষিত পে-স্কেলের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। সে ক্ষেত্রে মজুরি বোর্ড চাইলে গার্মেন্টস শ্রমিক ফ্রন্ট প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যাসহ বিস্তারিত মজুরি প্রস্তাবনা দাখিল করতে প্রস্তুত আছে।

নেতৃবৃন্দ আরও বলেন, মজুরি কম নির্ধারণ করা ছাড়াও চাকরি থেকে ছাঁটাইকৃত শ্রমিকদের আইনগত পাওনা থেকে বঞ্চিত করাকে শ্রম আইনের ১২৪-ক ধারা অনুযায়ী আপস-মীমাংসা নামে বৈধতা দেওয়া হচ্ছে। কারখানায় সক্রিয় ট্রেড ইউনিয়ন না থাকলেও মালিকদের লালিত লোকদের শ্রমিক প্রতিনিধির পরিচয় দিয়ে শ্রমিকদের প্রকৃত পাওনা থেকে বঞ্চিত করতে কলকারখানা পরিদর্শন অধিদপ্তরের কর্মকর্তা বা শিল্প পুলিশের কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে চুক্তি স্বাক্ষর করা হচ্ছে, যা সরকারের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা রক্ষকের দায়িত্বে থেকে ভক্ষকের ভূমিকায় নেমেছেন—তার প্রমাণ বহন করে।

নেতৃবৃন্দ আরও বলেন, নারায়ণগঞ্জে সেধুরি অ্যাপারেলস লিমিটেড ৩০ জুনে উৎপাদন বন্ধ

ঘোষণা ও শ্রমিক ছাঁটাই করে। শ্রমিকের চাকরির স্থায়ী অবসানের ৩০ কর্মদিবসের মধ্যে তাদের প্রাপ্য সকল পাওনা পরিশোধ করার আইনগত বাধ্যবাধকতা থাকা সত্ত্বেও এবং সেধুরি অ্যাপারেলস লিমিটেড শ্রমিক ইউনিয়নের সঙ্গে স্বাক্ষরিত চুক্তি অনুযায়ী ৩১ জুলাইয়ের মধ্যে সম্পূর্ণ পাওনা পরিশোধ করার কথা থাকলেও অদ্যাবধি তা করা হয়নি। মাসের পর মাস শ্রমিকদের টাকা পাওনা থাকা সত্ত্বেও প্রিমিয়ার ব্যাংক নারায়ণগঞ্জ শাখা রপ্তানির বিপরীতে প্রাপ্ত টাকা আটকে রেখেছে; শ্রম আইন অনুসারে শ্রমিকের পাওনা পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত কারখানার মালিকানা হস্তান্তর নিষিদ্ধ, অথবা নতুন মালিক কর্তৃক শ্রমিকের বকেয়া পাওনা পরিশোধের বাধ্যবাধকতা থাকা সত্ত্বেও ফকির অ্যাপারেল নামে অপর একটি কোম্পানির মালিকরা সেধুরি অ্যাপারেলস লিমিটেডের শ্রমিকদের পাওনা পরিশোধ না করেই সেধুরি অ্যাপারেলস লিমিটেডের কারখানা দখল করেছে, যা শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

নেতৃবৃন্দ সংশ্লিষ্ট ব্যাংক, অ্যাপারেল, ফকির কর্তৃপক্ষ, মালিক এবং সেধুরি অ্যাপারেলস লিমিটেডের মালিককে আইনের আওতায় এনে অবিলম্বে শ্রমিকদের পাওনা পরিশোধ করা না হলে পরিস্থিতির দায় মালিকদের বহন করতে হবে বলে সতর্ক করে দেন।

নেতৃবৃন্দ উৎপাদন ও শ্রমিকদের চাকরির সুরক্ষা নিশ্চিত করতে শিল্প কারখানায় গ্যাস-বিদ্যুৎ সরবরাহ অগ্রাধিকারভিত্তিতে নিশ্চিত করতে হবে এবং শিল্প মালিকদের নিয়ন্ত্রিত ডেটাবেজের নামে ব্ল্যাক লিস্টিং বন্ধ করে স্বাধীন ট্রেড ইউনিয়ন ও যৌথ দরকষাকষির অধিকারকে কাগজে-কলমে অবস্থানের পরিবর্তে স্বচ্ছভাবে চর্চার অনুকূল পরিবেশ নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান জানান।

গাইবান্ধায় সংগ্রাম পরিষদের মিছিলে হামলার তীব্র নিন্দা ও ক্ষোভ প্রকাশ



রিকশা, ব্যাটারি রিকশা-ভ্যান ও ইজিবাইক সংগ্রাম পরিষদ কেন্দ্রীয় পরিচালনা পরিষদের আহ্বায়ক খালেদুজ্জামান লিপন ও সদস্যসচিব ডা. মনীষা চক্রবর্তী এক বিবৃতিতে সংগ্রাম পরিষদের গাইবান্ধা জেলা শাখার মিছিলে গাইবান্ধা পৌরসভায় কর্মরত লোকজনের হামলা এবং সংগ্রাম পরিষদের নেতা গোলাম রাব্বানী, লাভলুসহ নেতৃবৃন্দ আহত হওয়ায় তীব্র নিন্দা ও ক্ষোভ প্রকাশ করেন এবং হামলাকারীদের গ্রেপ্তার ও বিচার দাবি জানান।

বিবৃতিতে নেতৃবৃন্দ বলেন, সড়কে শৃঙ্খলা ফেরানো, যানজট নিরসন, গাড়িচালক ও যাত্রীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে স্থানীয় সরকার ও

বিআরটিএর সমন্বয়ে সমন্বিত নীতিমালা ও বিধিমালা প্রণয়নসহ বিভিন্ন দাবিতে দেশব্যাপী জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী বরাবর স্মারকলিপি পেশের কর্মসূচির অংশ হিসেবে ১০ সেপ্টেম্বর গাইবান্ধায় ডিসি কার্যালয়ে স্মারকলিপি দিতে যাওয়ার পথে সংগ্রাম পরিষদের মিছিলে পৌরসভার লোকজন হামলা করে। হামলায় সংগঠনের নেতা গোলাম রাব্বানী, লাভলুসহ ১০-১২ জন আহত হয়।

নেতৃবৃন্দ অবিলম্বে সংগ্রাম পরিষদ উত্থাপিত ন্যায়সংগত দাবি মেনে নেওয়ার জন্য সরকারের প্রতি দাবি জানান। একই সঙ্গে হামলার সঙ্গে জড়িতদের গ্রেপ্তার ও বিচার দাবি করেন।

রাড্ডা ক্লিনিকে হামলা ও ভাঙচুরের সাথে জড়িতদের গ্রেপ্তার ও বিচার দাবি

মিরপুরে রাড্ডা ক্লিনিকে হামলা করে ভাঙচুর, ভবন গুঁড়িয়ে দেওয়া, ক্লিনিকের মালামাল লুট, ভূমি দখলের উদ্দেশ্যে সাইনবোর্ড বুলিয়ে দেওয়া, পুলিশের নিক্রিয়তায় প্রতিবাদে এবং ঘটনার সঙ্গে যুক্ত রাঘব-বোয়ালদের অতি দ্রুত গ্রেপ্তার-বিচার ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি পুনর্নির্মাণের দাবিতে ২৮ সেপ্টেম্বর রাড্ডা ক্লিনিকের সামনে গণতান্ত্রিক যুক্তফ্রন্ট বৃহত্তর মিরপুর আঞ্চলিক শাখার প্রতিবাদ সমাবেশ ও মিছিল অনুষ্ঠিত হয়।

সমাবেশে নেতৃবৃন্দ বলেন, গত কয়েক দিনে মিরপুরে এক নং-এ রাড্ডা স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র, ইসিবি স্কোয়ারে স্টুডিও ভাঙচুর, আদাবের বাড়ি দখলের অপচেষ্টা, লুটপাট, সম্ভ্রাসী কার্যক্রম জনমনে গভীর আতঙ্ক সৃষ্টি করেছে। সরকার এসব ঘটনা রোধে চরমভাবে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়ে চলেছে।

নেতৃবৃন্দ বলেন, আইনশৃঙ্খলার চরম অবনতির দায় সরকারকে নিতে হবে।



জাতিসংঘ আজ যেন ঠাট্টা-মশকরার রঙ্গমঞ্চে পরিণত হয়েছে

জাতিসংঘে যুদ্ধবাজদের আশ্ফালন : সমাজতন্ত্রই মানবজাতির ভরসা

একবার ভেবে দেখুন তো, জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের সভায় দাঁড়িয়ে অ্যাডলফ হিটলার ভাষণ দিচ্ছেন! হিটলার, জার্মানির ফ্যাসিবাদী স্বৈরাচারী শাসক—যিনি এবং যার সহযোগীদের ধ্বংসলীলায় স্তম্ভিত বিশ্বনেতারা যুদ্ধ বন্ধের জন্য এবং বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার কথা বলে জাতিসংঘের জন্ম দিয়েছিলেন, তিনি যদি বিশ্বের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা দিতেন, কী বলতেন তিনি? হিটলারের বিভিন্ন বক্তৃতায় আমরা দেখেছি—তিনি জার্মানির ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনা, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে রক্ষা করার কথা বলেছেন, ইউরোপের স্বার্থ সংরক্ষণের কথা বলে বাজার দখলের জন্য বিশ্বের ওপর চাপিয়ে দেওয়া যুদ্ধের পক্ষে সাফাই গেয়েছেন। একই কাজ করেছিলেন ইতালির বেনিতো মুসোলিনি, স্পেনের জেনারেল ফ্রান্সো। বাজার দখলের উন্মাদনায় এই যুদ্ধবাজ, দখলদারদের ধ্বংসযজ্ঞের মধ্য দিয়ে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর গঠিত লীগ অব নেশনস বা জাতিপুঞ্জের অসারতা চরমভাবে বিশ্ববাসীর সামনে ফুটে ওঠে। সে সময় বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১৯৪৫ সালের ২৪ অক্টোবর বিশ্বের মিত্রশক্তিগুলোর (মূলত যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত ইউনিয়ন, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স ও চীন) উদ্যোগে ৫০টি সদস্যদেশ নিয়ে জাতিসংঘের যাত্রা শুরু হয়। বর্তমানে জাতিসংঘের সদস্যদেশ ১৯৩টি।

হিটলারের বক্তৃতা দেখার সৌভাগ্য না হলেও, গত ২০২৬ সালের ৮ সেপ্টেম্বর থেকে নিউইয়র্কে জাতিসংঘের সদর দপ্তরে শুরু হওয়া জাতিসংঘের সাধারণ সভায় বিশ্বশান্তি (!) রক্ষার মঞ্চে আমরা কি হিটলারের বক্তব্যের প্রতিধ্বনিই শুনতে পাচ্ছি না? যে মঞ্চে মানবজাতির উন্নয়নে পারস্পরিক সহায়তামূলক বিশ্ব গড়ে তোলার পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা হওয়ার কথা ছিল, সেই মঞ্চকে আমরা যুদ্ধবাজদের আশ্ফালন, দঙ্কোক্তি ও হুমকির রঙ্গমঞ্চ হতে দেখছি।

জাতিসংঘের এবারের অধিবেশনে যুদ্ধবাজ প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প তাঁর ৩৭ মিনিটের ভাষণে বিশ্বের দেশে দেশে তাদের চাপিয়ে দেওয়া যুদ্ধ ও প্রক্সি যুদ্ধকে বৈধতা দিয়েছেন, এবং নিজেদের বিশ্বশান্তির অগ্রদূত হিসেবে ঘোষণা করেছেন। ২০২৪ সালের ৭ অক্টোবর হামাসের হামলায় নিহত ২ হাজার মানুষের জন্য তিনি দুঃখ প্রকাশ করেছেন, কিন্তু ইসরায়েলের

চালানো গণহত্যায় নিহত ৮০ হাজার ফিলিস্তিনির হত্যার কথা তিনি উল্লেখ করেননি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, জাতিসংঘে ফিলিস্তিনকে এখনো অ-সদস্য পর্যবেক্ষক রাষ্ট্র হিসেবে রাখা হয়েছে, কারণ নিরাপত্তা পরিষদে ফিলিস্তিনকে পূর্ণ সদস্যপদের সুপারিশের প্রস্তাবে যুক্তরাষ্ট্র ভেটো দেয়।

ট্রাম্প ইরানকে বিশ্বের সবচেয়ে সম্ভ্রাসী রাষ্ট্র হিসেবে উল্লেখ করে তাকে নিরস্ত্রীকরণ করার জন্য যা যা করা দরকার, আমেরিকা তা-ই করবে বলে সদস্তে ঘোষণা দেন। যুক্তরাষ্ট্রকে তিনি পৃথিবীর সবচেয়ে অসাধারণ, সবচেয়ে মহান, সবচেয়ে রোমাঞ্চকর দেশ বলে বারবার বক্তৃতায় উল্লেখ করে বলেন, সামরিক শক্তিতে আমেরিকার সঙ্গে টেক্কা দেওয়ার কেউ নেই।

২০২৬ সালের ৩ জানুয়ারি ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট মাদুরো ও তাঁর স্ত্রীকে ট্রাম্প মাফিয়া কায়দায় শোয়ার ঘর থেকে অপহরণ করে নিয়ে এসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জেলখানায় পুরে রেখেছে এবং তাঁর বিচার শুরু করেছেন—তাকে তিনি সম্ভ্রাসী, গণতন্ত্রের শত্রু হিসেবে উল্লেখ করেন। আবার তিনিই আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতকে অগ্রহণযোগ্য হিসেবে ঘোষণা দেন এবং তাদের পরিচালিত সব বিচারকে মশকরা হিসেবে তাল্হিল্য করেন! মাদুরো ও তাঁর স্ত্রীকে জেলে পুরে তাদের সঙ্গে ভালো তেল চুক্তি করার বিষয়ে ট্রাম্প রাখচাক না করেই জাতিসংঘে বলেন যে, তাদের দুই দেশের মিলিত তেলসম্পদ পৃথিবীর ৬০%, যা দিয়ে অনেক ভালো কিছু করা সম্ভব। ভেনেজুয়েলার আগের সরকার এটা বোঝেনি, বরং মাদক ব্যবসায়ীদের প্রশ্রয় দিয়েছে বলে তাঁকে এহেন ‘অ্যাকশন’ নিতে হয়েছে। একই সঙ্গে তিনি কিউবাকে একটি ব্যর্থ রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করেন এবং দ্রুত কিউবায় গণতন্ত্র পৌঁছাবে বলে আলোচনা চলছে বলে জানান। এ সময় কিউবার প্রতিনিধিদল সভাকক্ষ থেকে ওয়াকআউট করে। একই সঙ্গে তিনি বলেন, কমিউনিজম কোনো দিন আমেরিকায় পৌঁছাবে না। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো, যে শহরে বসে ট্রাম্প এই বক্তৃতা দিচ্ছেন, সেই শহরে দুইজন এবারের নগর সরকার নির্বাচনে আমেরিকান কমিউনিস্ট পার্টির বামপন্থী কাউন্সিলর নির্বাচিত হয়েছেন এবং নিউইয়র্কে মেয়র হয়েছেন

জোহরান মামদানি, যিনি নিজেকে একজন সমাজতন্ত্রী হিসেবে পরিচয় দেন। এরপর ট্রাম্প গ্রিনল্যান্ডে সামরিক ঘাঁটি নির্মাণ করার ঘোষণা দিয়ে বলেন, আর্কটিক অঞ্চলে আমেরিকার এই পদচিহ্ন ন্যাটো ও ইউরোপকে শক্তিশালী করবে।

ট্রাম্প শুধু যুদ্ধকেই বৈধতা দেননি, পরিবেশ নিয়ে সচেতনতামূলক কথাবার্তা নিয়েও তিনি বিরক্তি প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন, বৈশ্বিক কার্বন কর বলে কিছু থাকতে পারে না, এতে ব্যবসার ক্ষতি হবে। বৈশ্বিক উষ্ণতা বলেও আসলে কিছু হয় না বলেই লোকে এখন একে জলবায়ু পরিবর্তন বলে—একথা বলে তিনি বৈশ্বিক উষ্ণতার ভয়াবহতাকে একটা ঠাট্টায় পরিণত করেন। সারা পৃথিবীতে খ্রিস্টানরা আক্রান্ত হচ্ছে, কিন্তু কেউ সেটা নিয়ে কথা বলে না—এ নিয়ে তিনি উদ্বেগ প্রকাশ করেন। অবৈধ অভিবাসীদের তিনি ‘এলিয়েন’ হিসেবে আখ্যায়িত করেন এবং এদের ঢুকতে না দেওয়ার ব্যাপারে তাঁর কঠোর অবস্থান পুনর্বাক্ত করেন।

জাতিসংঘে ইসরায়েলের প্রেসিডেন্ট নেতানিয়াহু তাঁর বক্তব্যে ফিলিস্তিনের ওপর তাঁদের যুদ্ধ চালানো কতটা যৌক্তিক, তার ফিরিস্তি তুলে ধরেন। নেতানিয়াহু বক্তব্য দিতে উঠলে ফিলিস্তিনে ইসরায়েলের চালানো গণহত্যার প্রতিবাদে বেশির ভাগ দেশের প্রতিনিধিরা সভাকক্ষ ছেড়ে চলে যান। নেতানিয়াহু তাঁর বক্তব্যের শুরুতেই সভাকক্ষ ছেড়ে চলে যাওয়া প্রতিনিধিদের ‘নৈতিক কাপুরুষ’ বলে আখ্যায়িত করেন। তিনি ইসরায়েলের সামরিক বাহিনী (IDF)-কে পৃথিবীর সবচেয়ে নৈতিক বাহিনী (!) বলে আখ্যায়িত করেন। ফিলিস্তিনে শিশুদের স্কুল, হাসপাতাল গুঁড়িয়ে দেওয়া প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, হামাস ওগুলোকে মানবচাল হিসেবে ব্যবহার করে, তাই তাদের এমন করতে হয়েছে। ইসরায়েল গণহত্যা শুরু করেনি, বরং গণহত্যা প্রতিরোধে ভূমিকা রেখেছে বলে তিনি দাবি করেন। তিনি পৃথিবীর ইহুদিদের ইসরায়েলের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান জানান। ইউরোপে ইসরায়েলবিরোধী বিক্ষোভ নিয়ে তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তিনি নিউইয়র্কের মেয়র জোহরান মামদানিকে, যিনি নেতানিয়াহুকে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের গ্রেপ্তারি পরোয়ানা মেনে গ্রেপ্তার করার দাবি জানিয়েছিলেন, ইহুদিবিরোধী

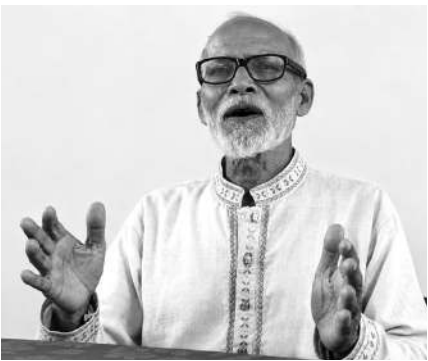
বলে আখ্যায়িত করেন। কিন্তু তাঁর ভাষণ শোনার জন্য মাত্র ২৪টি দেশের প্রতিনিধি জাতিসংঘের সভাকক্ষে ছিলেন। বাকি ৭৭টি দেশ এই যুদ্ধবাজের বক্তব্য বর্জন করেছিল।

যুদ্ধবাজের গর্জন আর সভা বর্জনের এই জাতিসংঘের সভা আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় যে, সাম্রাজ্যবাদী পরাজিতগুলোর দাপটের বিশ্বে কোনো সংঘ-সমিতি করে যুদ্ধ বন্ধ করা যায় না। কার্ল মার্কস পুঁজির অদম্য মুনাফার ক্ষুধার তীব্রতা বোঝাতে পুঁজি গ্রন্থে টি. জে. ড্যানিং-এর উদ্ধৃতি ব্যবহার করেছেন। ‘যথেষ্ট মুনাফা পেলে পুঁজি অত্যন্ত দুঃসাহসী হয়ে ওঠে। ১০ শতাংশ মুনাফা নিশ্চিত হলে পুঁজি যেকোনো জায়গায় বিনিয়োগ করবে; ২০ শতাংশ নিশ্চিত হলে তা প্রবল আগ্রহ সৃষ্টি করবে; ৫০ শতাংশ হলে তা দুঃসাহসিকতায় পরিণত হবে; ১০০ শতাংশ মুনাফা হলে তা সমস্ত মানবিক আইন পদদলিত করতে প্রস্তুত হবে; আর ৩০০ শতাংশ মুনাফা হলে এমন কোনো অপরাধ নেই, যা করতে পুঁজি ইতস্তত করবে, এমন কোনো ঝুঁকি নেই, যা নিতে সে পিছপা হবে—এমনকি তার মালিকের ফাঁসিতে ঝোলার ঝুঁকি থাকলেও।

মুনাফার খোঁজে, বাজারের খোঁজে পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বে যুদ্ধ থাকবেই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীর অস্ত্র ব্যবসার অর্ধেক নিয়ন্ত্রণ করে। ফ্রান্স, রাশিয়া, জার্মানির মতো দেশগুলোও এই অস্ত্র ব্যবসার প্রতিযোগী। ফলে ব্যবসা টিকিয়ে রাখতে যুদ্ধ লাগবে। আর সভ্যতা টিকিয়ে রাখতে লাগবে সমাজতান্ত্রিক পৃথিবী। মুনাফা নয়, মানুষ আগে, মানুষের অধিকার ও নিপাত্ত আগে, পরিবেশ আগে—এই নীতি পুঁজিবাদে বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়। তাই দেশে দেশে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন শক্তিশালী না হলে জাতিসংঘের মতো আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোও এমন মর্মান্তিক রসিকতায় পরিণত হবে।

এই সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকে মোকাবিলা করার জন্য বিশ্বের দেশে দেশে শ্রমজীবী, মেহনতি ও গণতন্ত্রে বিশ্বাসী মানুষের দৃঢ় ঐক্য গড়ে তুলতে হবে। এই লড়াই কেবল একটি দেশের নয়; এটি বিশ্বব্যাপী শোষিত ও বঞ্চিত মানুষের সম্মিলিত সংগ্রাম। শ্রমজীবী মানুষের ঐক্যবদ্ধ লড়াই একটি ন্যায়সংগত, গণতান্ত্রিক ও মানবিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে পারে।

কমরেড শাহজাহানের মৃত্যুতে শোক



বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ ২ সেপ্টেম্বর ’২৬ এক শোক বিবৃতিতে বাসদ ময়মনসিংহ জেলা শাখার সদস্য, প্রবীণ রাজনীতিক, বীর মুক্তিযোদ্ধা কমরেড শাহজাহান মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেন।

বিবৃতিতে কমরেড ফিরোজ বলেন, কমরেড শাহজাহান ছিলেন একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা ও আজীবন বিপ্লবী। তিনি পুঁজিবাদী শোষণ-নিপীড়ন

ও দুঃশাসনের কবল থেকে শ্রমজীবী মানুষের মুক্তির লক্ষ্যে আজীবন সমাজতন্ত্রের পক্ষে লড়াই করেছেন। তাঁর এই অসামান্য অবদান আমরা গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি।

উল্লেখ্য, গত ১ সেপ্টেম্বর রাত ৯টায় তিনি ময়মনসিংহ শহরে অটোরিকশা দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হন। তাকে প্রথমে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়, সেখানে চিকিৎসকেরা ওই হাসপাতালে চিকিৎসা সম্ভব নয় জানালে তাকে শহরের প্রান্ত স্পেশালাইজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়। কমরেড ফিরোজ বলেন, কমরেড শাহজাহানের মৃত্যুতে পার্টি একজন নিবেদিত কর্মীকে হারালো।

কমরেড ফিরোজ তাঁর মৃত্যুতে গভীর শোক ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন এবং একই সাথে তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্য ও আত্মীয়স্বজনদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানান। উল্লেখ্য, তাঁর মৃত্যুতে বাসদ ময়মনসিংহ জেলা ও ময়মনসিংহের সমাজতান্ত্রিক, প্রগতিশীল ও গণতান্ত্রিক দলগুলো শোক প্রকাশ করেছেন।

বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. শহিদুর রহমানের মৃত্যুতে শোক



বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ ১৮ সেপ্টেম্বর ’২৬ এক শোক বিবৃতিতে প্রগতিশীল কৃষিবিদ ফোরাম, রংপুর জেলার সংগঠক ও বাসদ সমর্থক, বীর মুক্তিযোদ্ধা কমরেড শহিদুর রহমানের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেন।

বিবৃতিতে কমরেড ফিরোজ বলেন, কমরেড শহিদুর রহমান দেশকে স্বাধীন করার লক্ষ্যে একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে যেমন লড়াই করেছেন, তেমনি তিনি শোষণহীন সমাজের স্বপ্ন দেখতেন। তাই তিনি পুঁজিবাদী শোষণ-নিপীড়ন ও দুঃশাসনের কবল থেকে শ্রমজীবী মানুষের মুক্তির লক্ষ্যে আজীবন সমাজতন্ত্রের পক্ষে সমর্থন ও সহযোগিতা করেছেন। তাঁর এই অবদান আমরা গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি।

কমরেড ফিরোজ, তাঁর মৃত্যুতে গভীর শোক ও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন এবং একই সঙ্গে তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্য ও আত্মীয়স্বজনের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানান। উল্লেখ্য, তাঁর মৃত্যুতে বাসদ রংপুর জেলা শাখার পক্ষ থেকেও শোক প্রকাশ করা হয়।

উল্লেখ্য, শহিদুর রহমান কিছুদিন ধরে বার্ধক্যজনিত রোগে ভুগছিলেন। ১৮ আগস্ট তিনি রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর মৃত্যুতে বাসদ একজন গুণাকাজক্ষী ও দরদি মানুষকে হারাল।

উর্বর কৃষি জমিতে সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্প না করার আহ্বান

সংবাদ সম্মেলনে কৃষক ও
ক্ষেতমজুর সংগ্রাম পরিষদের
নেতৃবৃন্দ

উর্বর কৃষি জমি ধ্বংস, বসতভিটা থেকে মানুষকে উচ্ছেদ করে সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্প স্থাপন না করার দাবিতে ১৫ সেপ্টেম্বর '২৬ ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির সাগর-রশ্মী মিলনায়তনে কৃষক ও ক্ষেতমজুর সংগ্রাম পরিষদ সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। লিখিত বক্তব্য রাখেন সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক ও ক্ষেতমজুর সমিতির কার্যকরী সভাপতি অ্যাডভোকেট আনোয়ার হোসেন রেজা।

সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন কৃষক সমিতির সভাপতি অ্যাডভোকেট এসএমএ সবুর, ক্ষেতমজুর সমিতির সভাপতি ডা. ফজলুর রহমান, বাংলাদেশ কৃষক-ক্ষেতমজুর সমিতির সভাপতি অধ্যাপক আব্দুস সাত্তার, সমাজতান্ত্রিক ক্ষেতমজুর ও কৃষক ফ্রন্টের সাংগঠনিক সম্পাদক নিখিল দাস, বাংলাদেশ কৃষক ফোরামের সভাপতি জগলুল পাশা, কৃষক ক্ষেতমজুর সংগঠনের আলমগীর হোসেন দুলাল, ভুক্তভোগী কৃষক আব্দুল মজিদ প্রমুখ।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে বলা হয়, বৈশ্বিক উষ্ণায়ন ও জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় সারা বিশ্বই কার্বন নিঃসরণ কমাতে



জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যবহার সংকোচন করে ঝুঁকছে নবায়নযোগ্য জ্বালানিতে। তার অংশ হিসেবে বাংলাদেশও সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদন বাড়ানোর চেষ্টা করেছে। কিন্তু দেশের বিভিন্ন স্থানে নীতিমালা অমান্য করে ফসলি জমিতে সৌরবিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনের ফলে কৃষক কৃষিজমি হারাচ্ছে, এর ফলে দেশের মানুষ খাদ্যসংকটে পড়বে। ময়মনসিংহের ভালুকায় সৌরবিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনের জন্য যে জমি নির্ধারণ করা হয়েছে সেটি ফসলি জমি, বসতবাড়ি, স্কুল-মসজিদ, কবরস্থানের মধ্যে পড়েছে। এ ছাড়াও কিশোরগঞ্জ, চট্টগ্রাম, কুড়িগ্রাম, পঞ্চগড়, লালমনিরহাট, নেত্রকোণা,

টাঙ্গাইলে ১টি করে ও কক্সবাজারে ২টি করে মোট ১০টি সৌরবিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনে গত এপ্রিলে দরপত্র আহ্বান করে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (পিডিবি)। স্বাধীন বিদ্যুৎ উৎপাদক (আইপিপি) পদ্ধতিতে ২০২৯ সালের জানুয়ারির মধ্যে এসব কেন্দ্র উৎপাদনে আনার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। আইপিপি পদ্ধতিতে স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান নিজস্ব বিদ্যুৎকেন্দ্রে বিদ্যুৎ উৎপাদন করে।

ময়মনসিংহের ভালুকা উপজেলার নন্দীপাড়া ও ঝালপাজা মৌজার ১৭৩.১৩ একর জমিতে সৌরবিদ্যুৎকেন্দ্রে জমি নির্ধারণ নিয়ে বিতর্ক দেখা দিয়েছে। সৌরবিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনের

দরপত্রে অংশ নিতে হলে নির্ধারিত জমির বিপরীতে কৃষি বিভাগের অনাপত্তি প্রয়োজন। উপজেলার হবিরবাড়ী ইউনিয়নে ৪৫ মেগাওয়াট উৎপাদনক্ষমতার এই বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের জন্য যে জায়গা নির্ধারণ করা হয়েছে, তা 'কৃষিজমি' উল্লেখ করে প্রথমে আপত্তি জানিয়েছিল উপজেলা কৃষি বিভাগ। পরে 'চাপের মুখে' অনাপত্তিপত্র দিতে কৃষি বিভাগ বাধ্য হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। স্থানীয় কৃষকদের মতামতের তোয়াক্কা না করে, সাংসদের স্ত্রীর নামে দরপত্র পাওয়া উক্ত বিদ্যুৎকেন্দ্রের জন্য জমি জবরদখলের চেষ্টা চলছে বলে জানা গেছে।

সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়, বিগত আওয়ামী সরকারের আমলে ময়মনসিংহের মুক্তাগাছা উপজেলায় কৃষি জমিতে সৌরবিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনের কাজ শুরু হয়। তাতে বেকায়দায় পড়েন কৃষক ও মৎস্যচাষিরা। এই প্রকল্পের কারণে জলাবদ্ধতার কবলে পড়ে ফসলি জমি ও মাছের ঘের। প্রতিদিন সেচ মেশিন দিয়ে পানি নিষ্কাশন করেও রেহাই পাচ্ছেন না হাজারো চাষি।

বাংলাদেশের আইন অনুযায়ী, বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য সরাসরি কৃষি জমি বা চাষযোগ্য ফসলি জমি ব্যবহার করা নিষিদ্ধ। সরকারের 'ভূমি ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ ও কৃষিভূমি সুরক্ষা আইন' অনুযায়ী, দুই বা ততোধিক ফসলি জমি নষ্ট করে কোনো বাণিজ্যিক সোলার প্ল্যান্ট করা যাবে না। এরপর পৃষ্ঠা ১২ কলাম ১

সচিবালয় অভিমুখে বিক্ষোভে পুলিশের বাধা

ডেঙ্গু-হামের প্রাদুর্ভাব নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থতায় বিপুল প্রাণহানির দায় সরকারকে নিতে হবে

গণতান্ত্রিক যুক্তফ্রন্ট

ডেঙ্গু ও হামে বিপুলসংখ্যক শিশুসহ মানুষের মৃত্যু রোধে সরকারের উদাসীনতা, নির্লিপ্ততা এবং সংক্রমণ ও প্রাদুর্ভাব নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থতার প্রতিবাদে গণতান্ত্রিক যুক্তফ্রন্টের সচিবালয় অভিমুখে বিক্ষোভ মিছিলে বাধা দিয়েছে পুলিশ। ২৪ সেপ্টেম্বর '২৬ সকাল ১১টায় জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে অনুষ্ঠিত সমাবেশ শেষে সচিবালয় অভিমুখে বিক্ষোভ মিছিল ও প্রধানমন্ত্রী বরাবর স্মারকলিপি প্রদান কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।

গণতান্ত্রিক যুক্তফ্রন্টের কেন্দ্রীয় পরিচালনা পরিষদের সমন্বয়ক ও সিপিবি'র সাধারণ সম্পাদক আবদুল্লাহ ক্বাফী রতনের সভাপতিত্বে এবং বাসদ (মার্কসবাদী)-এর কেন্দ্রীয় নেতা ডা. জয়দীপ ভট্টাচার্যের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদের সাধারণ সম্পাদক কমরেড বজলুর রশীদ ফিরোজ, বাংলাদেশ জাসদের স্থায়ী কমিটির সদস্য ডা. মুশতাক হোসেন, সিপিবি'র কেন্দ্রীয় কমিশনের সদস্য অধ্যাপক ডা. আবু সাঈদ, বিপ্লবী কমিউনিস্ট লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য অধ্যাপক ডা. হারুন-অর-রশীদ, গণতান্ত্রিক বিপ্লবী পার্টির সাধারণ সম্পাদক মোশাররফা মিশু, বাসদ (মাহবুব)-এর কেন্দ্রীয় নেতা মহিউদ্দিন চৌধুরী লিটন, জাতীয় গণফ্রন্টের সমন্বয়ক রজত হুদা, সোনার বাংলা পার্টির সভাপতি সৈয়দ হারুন অর রশীদ প্রমুখ।



বিক্ষোভ-পূর্ব সমাবেশে নেতৃবৃন্দ বলেন, ডেঙ্গু ও হামের মতো প্রতিরোধযোগ্য রোগে মানুষের মৃত্যু কোনো স্বাভাবিক ঘটনা হতে পারে না। জনস্বাস্থ্য সুরক্ষা রাষ্ট্রের মৌলিক দায়িত্ব হলেও রোগের বিস্তার নিয়ন্ত্রণ, কার্যকর প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ এবং আক্রান্ত ব্যক্তিদের যথাযথ চিকিৎসা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে সরকারের উদ্যোগ দৃশ্যমান নয়। এর ফলে বিপুলসংখ্যক শিশু ও সাধারণ মানুষ অকালমৃত্যু, পরিবারের আর্থিক ক্ষতি ও দুর্ভোগের শিকার হচ্ছেন। আক্রান্ত ব্যক্তির সূস্থ হওয়ার পর নানা জটিলতায় ভোগেন। ডেঙ্গু থেকে সূস্থ হওয়ার পর শিশুদের মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী ক্লান্তি, চুল পড়া ও দৃষ্টি সমস্যার ঝুঁকি বেড়ে। হামের প্রভাবে শিশুর

ইমিউন স্মৃতিকে মুছে দিয়ে অন্যান্য রোগের বিরুদ্ধে অসহায় করে তোলে এবং মারাত্মক নিউরোলজিক্যাল রোগের ঝুঁকি তৈরি করে।

তাঁরা আরও বলেন, ডেঙ্গুর প্রকোপ প্রতিবছরই নতুন করে জনস্বাস্থ্য সংকট সৃষ্টি করছে। সরকার মশকনিধন কার্যক্রমে দুর্নীতি ও লুটপাট বন্ধে কোনো কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি।

নেতৃবৃন্দ বলেন, হাম ও হামের উপসর্গ নিয়ে বিগত অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সময় থেকে এখন পর্যন্ত সহস্রাধিক শিশু মৃত্যুবরণ করেছে। এই নজিরবিহীন শিশুমৃত্যুর জন্য দায়ীদের চিহ্নিত করে বিচারের মুখোমুখি করতে নিরপেক্ষ বিচার বিভাগীয় তদন্ত করতে হবে।

সমাবেশ শেষে সচিবালয় অভিমুখে বিক্ষোভ

মিছিলে পুলিশ বাধা দিলে, গণতান্ত্রিক যুক্তফ্রন্টের তিন সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল প্রধানমন্ত্রী বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করে।

স্মারকলিপিতে ডেঙ্গু ও হামের প্রাদুর্ভাব মোকাবিলায় ছয় দফা সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব তুলে ধরা হয়।

১. হামের মহামারি মোকাবিলা ও ডেঙ্গুর মহামারি প্রতিরোধে জনস্বাস্থ্যের জরুরি পরিস্থিতি ঘোষণা করতে হবে। প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে জাতীয় স্বাস্থ্য দুর্যোগ মোকাবিলা কমিটি গঠন করে সরকার ও জনগণকে সঙ্গে নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে।

২. ছয় মাস থেকে ১৫ বছর বয়সি সব মানুষকে জরুরিভিত্তিতে পরিকল্পনামাফিক হামের টিকা দিতে হবে।

৩. কমিউনিটি পর্যায়ে, বিশেষ করে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মানুষের জন্য বাড়ি বাড়ি গিয়ে বিনামূল্যে ডেঙ্গু পরীক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে।

৪. মাধ্যমিক পর্যায়ের হাসপাতালগুলোতে ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর হাম ও ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগীদের ভর্তি করে চিকিৎসা দিতে হবে।

৫. দেশের সব মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ও বিশেষায়িত হাসপাতালে জরুরি ও জীবনরক্ষাকারী চিকিৎসা, পরীক্ষা এবং ওষুধ বিনা মূল্যে ও হরানিমুক্তভাবে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। সারা দেশে এসব ব্যবস্থা সমানভাবে নিশ্চিত করতে হবে।

৬. এডিস মশা নিয়ন্ত্রণে জনগণকে সম্পৃক্ত করে বছরব্যাপী পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালনা করতে হবে।